জাতীয় সাহিত্য

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা
১৯৩৬

প্রকাশক
শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৭৭, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ঃ

.

দ্বিতীয় মুদ্রণ

কলিকাতা ইউনিভারসিটি প্রেসে
শ্রীভূপেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

মূল্য এক টাকা

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎনামক প্রবন্ধে আশুতোষ ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তাঁর মনের সর্ব্বোচ্চ কামনার ও সাধনার যে চিত্র এঁকেছেন তাতে এই কর্ম্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব আমি সুস্পষ্টরূপে অনুভব করেচি। তাঁর বলিষ্ঠ প্রকৃতি শিক্ষানিকেতনে দুরূহ বাধার বিরুদ্ধে আপন সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র অধিকার করেছিল। এইখানে তিনি সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি ও জ্ঞানসম্পদের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব ও উদার কল্পনাশক্তি সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎকে ধ্রুব আশ্রয় দেবার অভিপ্রায়ে সেই বিদ্যানিকেতনের প্রসারীকৃত ভিত্তির উপর স্থায়ী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেছিল। এই প্রবন্ধে সেই তাঁর মহতী ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বরূপটি দেখে সেই পরলোকগত মনস্বী পুরুষের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্ব্বভাষ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক এবং তাঁহার মাতা জগত্তারিণী দেবী একজন আদর্শ রমণী ছিলেন। মাতাপিতার অতন্দ্রিত যত্ন ও সতর্কতার মধ্যে আশুতোষের বাল্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বালক আশুতোষ একটি শিশু-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর-মধ্যে ঐ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া, তিনি কিয়ৎকাল গৃহশিক্ষকের নিকট পাঠাভ্যাস করেন এবং পরে ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বান স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েন। তখন বিখ্যাত ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

১৮৭৯ সালের নভেম্বর মাসে আশুতোষ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে চার্ল্‌স্ টনি ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ফার্ষ্ট্ আর্টস্ পরীক্ষার পূর্ব্বে আশুতোষ পীড়িত হইয়া পড়েন, কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৮৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে আশুতোষ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি. এ. পরীক্ষা পাস করেন এবং পরবৎসর গণিতে ও তৎপর বৎসর

পদার্থ-বিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষা পাস করেন। তিনি ১৮৮৬ সালে ২২ বৎসর বয়সে গণিতে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং ইহার দুই মাস পরেই সাহিত্যে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করেন। আশুতোষের যেরূপ অসাধারণ প্রতিভা ছিল, তাহাতে তিনি ঐ বৃত্তির জন্য প্রার্থী হইলে অন্য ছাত্রের পক্ষে উহা লাভ করা কঠিন হইত। বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে তাঁহার প্রার্থনা উপেক্ষা করিলেও, তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই; আশুতোষ যে বৎসর গণিতে এম. এ. পাস করিলেন, তাহার পরবৎসরই এম. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছিলেন। গণিতে তাঁহার যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহা ভারতের বাহিরেও স্বীকৃত হইয়াছিল। এডিনবরার রয়েল সোসাইটী, আয়ারল্যণ্ডের রয়েল একাডেমি এবং আরও বহু গণিত-সভা তাঁহাকে সভ্যপদে বরণ করিয়াছিল। গণিত ভিন্ন অন্য বিষয়েও আশুতোষের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ঐ সকল বিষয়েও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আশুতোষ যদি সারাজীবন গণিতের চর্চ্চা করিয়া কাটাইতেন, তাহা হইলেও তিনি যে বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তির অধিকারী হইতে পারিতেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা তিনি তাঁহার দেশের ও জাতির সেবাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার সার আল্‌ফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক-পদে নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্-চান্সেলার সার কোর্ট্‌নে ইল্‌বার্ট তাঁহার উপকার করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু আশুতোষের লক্ষ্য অনেক উচ্চে

ছিল। তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া দেশের শিক্ষা-প্রণালীর উন্নতি-সাধন করিবেন। তাঁহার দেশের মেধাবী যুবকবৃন্দ যাহাতে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে গৌরবময় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে,—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য।

আশুতোষ বি. এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাই কোর্টের উকীল হইলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি সার রাসবিহারী ঘোষের নিকট চুক্তিবদ্ধ (articled) সহকারী থাকিয়া আইনের প্রয়োগ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হাই কোর্টের জজ নিযুক্ত হয়েন। আইন ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেও তিনি জজিয়তী গ্রহণ করেন এই মানসে যে, ইহাতে তাঁহার যেটুকু অবসর থাকিবে, সেই অবসর-সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায়, দেশের সেবায় নিয়োগ করিতে পারিবেন। ১৯০৪ হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত আশুতোষ জজের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার মধ্যে একবার তিনি চীফ্ জষ্টিসের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। জজ হিসাবে সর্ব্বত্র তাঁহার সুনাম ছিল এবং তিনি যে সমস্ত নজীর রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আইনের পণ্ডিতেরও বিস্ময়ের কারণ। তাঁহার বিচারে সূক্ষ্মদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও অধ্যবসায়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল কারণে, যে সকল মনস্বী হাই কোর্টের জজের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্থান অতি উচ্চে।

হাই কোর্টের জজের কঠোর দায়িত্বপূর্ণ, বহু শ্রমসাধ্য কর্ম্ম

করিয়াও আশুতোষ দেশের কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিবার অসাধ্যসাধন হইতে বিরত হয়েন নাই। নিজের স্বাস্থ্য ও পারিবারিক কর্ত্তব্যে উদাসীন থাকিয়া তিনি দেশের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণে বিধাতা যেরূপ জাতীয়তা ও স্বদেশ-প্রেমের অসাধারণ প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার বাহুতেও সেইরূপ বিরাট্ কর্ম্মশক্তি দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে তাঁহার শুধু অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি ও অলৌকিক সৃষ্টিপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করে তাহা নহে; ইহা তাঁহার জাতীয়তা-বুদ্ধিরও প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আশুতোষেরই চেষ্টায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতীয়েরা তাহাদের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয় সত্যই বাঙ্গালীর সম্পত্তি হইয়াছে; ইহা আশুতোষের সামান্য কৃতিত্ব নহে।

সার আশুতোষের চরিত্র নৈতিক সম্পদে ভূষিত ছিল। এই নৈতিক চরিত্র-বলের জন্য তিনি দেশের সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। কি সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারাসনে, কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে, সর্ব্বত্রই তাঁহার নির্ভীকতা ও সাহসের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইত। এই স্বাধীনচেতা মহাপুরুষ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তাঁহার অপ্রতিহত তেজের নিকট সকলেই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিত। শ্রেষ্ঠ রাজ-পুরুষগণের সহিত ব্যবহারেও তিনি কখনও সংকীর্ণ স্বার্থের লোভে মস্তক অবনত করেন নাই। বস্তুতঃ এই তেজোদৃপ্ত পুরুষসিংহের চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার নির্ভীকতা। এই জন্য তিনি 'বাংলার বাঘ' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সত্যকে আশ্রয় করিয়া তিনি স্বৈর গতিতে কল্যাণের পথে, প্রগতির

দিকে চলিতেন। কোনও সংকীর্ণতা, দৈন্য, তুচ্ছ স্বার্থাভিসন্ধি তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত করিতে পারে নাই। কোনও বিরাট্ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইলে, কোনও উদার কল্পনাকে রূপ দান করিতে হইলে যে সকল গুণের সমবায় আবশ্যক, তাহা তাঁহাতে পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। বিপুল কল্পনাশক্তি ও তাহাকে মূর্ত্তি দান করিতে হইলে যে অক্লান্ত সাধনা আবশ্যক, সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য ও তাহাকে শ্রেয়স্কর পন্থায় পরিচালিত করিতে হইলে যে প্রতিভার আবশ্যক, আশুতোষের চরিত্রে তাহার অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছিল।

আশুতোষ অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই প্রতিভা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অকাতরে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম। আশুতোষ ২৫ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদে মনোনীত হয়েন এবং ১৮৮৯ সাল হইতে জীবনের শেষ দিবস (১৯২৪ খৃষ্টাব্দ, ২৫শে মে) পর্য্যন্ত এই সদস্যপদের অধিকারী ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি একাধিক বার ভাইস্-চান্সেলারের পদে বৃত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারকল্পে যখন আইন প্রণীত হয়, তখন তাহার জন্য যে সমিতি গঠিত হয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরূপে সেই সমিতির সভ্য মনোনীত হয়েন। এই আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল নূতন বিধি (Regulations) প্রস্তুত হয়, তাহা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হইয়াছিল। ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি ভাইস্-চান্সেলারের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য অসামান্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন। এই সময়ের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় অভূতপূর্ব্ব

উন্নতি লাভ করে। ১৯১৭ সালে যখন পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট্ শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয় নিজ হস্তে গ্রহণ করে, তখন আশুতোষের সাহস ও প্রতিষ্ঠানগঠন-নৈপুণ্যে সকলে বিস্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াই দায়িত্ব শোধ করিত। এখন হইতে নানা বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান ও গবেষণার ভারও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিল। আশুতোষের নেতৃত্বে এই বিশালায়তন নব প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল এবং ইহার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিবার ভারও তাঁহার সুপরিসর স্কন্ধে অর্পিত হইল।

এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই আশুতোষ ভারতের দেশীয় ভাষাগুলির পঠন-পাঠনের আয়োজন করিয়া দেশের ধন্যবাদভাজন হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য অনাদৃত ছিল। কলিকাতায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাঙ্গালা সাহিত্য একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়-মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু ১৮৬৮ সাল হইতে এই ব্যবস্থা উঠিয়া যায়। ইংরেজি সাহিত্যের নূতন রসাস্বাদে বিভোর বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষাকে অবজ্ঞা করিতেই শিক্ষা করিলেন! পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ করিব, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় বিদ্বান্ হইব, ইহাই তখন ছিল বাঙ্গালীর চরম লক্ষ্য।

১৮৮৯ সালে সিনেটের সদস্যপদ প্রাপ্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই আশুতোষ সিণ্ডিকেটে প্রবেশ লাভ করেন। তখন হইতেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কি উপায়ে পুনরায় বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তিনি ১৮৯১ সালের ফ্যাকাল্টি অব আর্ট্স্ সভার একটি অধিবেশনে প্রস্তাব করেন যে, এফ. এ.

এবং বি. এ. পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন করে, তাহাদিগকে বাঙ্গালা, হিন্দী অথবা ওড়িয়া ভাষায় এবং যাহারা পার্সী অথবা আর্বী অধ্যয়ন করে, তাহাদিগকে উর্দ্ ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে; তিনি এই সঙ্গে আরও প্রস্তাব করেন যে, এম্. এ. পরীক্ষার্থিগণকে ইংরেজি ভাষায় রচনা লেখার সহিত উল্লিখিত ভারতীয় ভাষার কোনও একটি ভাষায়ও রচনা লিখিতে হইবে। আশুতোষের এই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয় নাই।

কিন্তু আশুতোষ তাঁহার সঙ্কল্পচ্যুত হইবার পাত্র নহেন। ১৮৯৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য বিষয়-মধ্যে গণ্য করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে একটি অনুরোধ-প্রস্তাব পাঠাইয়া দেন। এই অনুরোধ-সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ফ্যাকাল্টি অব আর্ট্স্ কর্ত্তৃক যে কমিটি নিযুক্ত হয়, আশুতোষ সেই কমিটির অন্যতম সভ্য মনোনীত হইলেন। এই কমিটির মন্তব্য সিনেট কর্ত্তৃক গৃহীত হইল এবং স্থির হইল যে, এফ্. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা ও উর্দ্ ভাষায় রচনার পরীক্ষা গৃহীত হইবে; ছাত্রগণ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাঁহাদের সার্টিফিকেটে সে বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে, তবে রচনার পরীক্ষা দেওয়া না-দেওয়া ছাত্রের ইচ্ছাধীন।

বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নববিধি প্রবর্ত্তিত হইল, তাহাতে বি. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনা ও পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনার সহিত যাহাতে ছাত্রগণ পরিচয় লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য কতকগুলি গ্রন্থ আদর্শরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া ছাত্রগণের

পক্ষে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিগণের সুললিত কাব্য-গাথার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রদান করিল। এ সকলই আশুতোষের অক্লান্ত চেষ্টার ফল। অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গ-ভাষার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, বঙ্গবাসী চিরদিন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

এম্. এ. পরীক্ষায় ভারতীয় ভাষার পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট প্রতিষ্ঠান-গঠনের অল্পকাল পর হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; ইহাও আশুতোষের অন্যতম কীর্ত্তি। ইহার পূর্ব্বে দেশীয় ভাষায় সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ভারতের অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারে নাই। এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত কলেজেই বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে। নানা বিভাগে যাহাতে বঙ্গভাষার সম্পদ্ বর্দ্ধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। বঙ্গভাষার ভাগ্যে এরূপ শুভ যুগ আর কখনও আসে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মনস্বী আশুতোষই এই শুভ যুগের প্রবর্ত্তক, ইহা স্মরণ না রাখিলে এই পুস্তকের অধিকাংশ স্থলের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। আশুতোষ ভগীরথের ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের পুণ্যপ্রবাহ আপামর সাধারণের জন্য বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে বহাইয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার উদাত্ত স্বরে বঙ্গীয় যুবকগণকে বলিতেন: 'সর্ব্বোপরি, আপ্রাণচেষ্টায় মাতৃ-ভাষার অনুশীলন কর; মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই দেশের জন-সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে।'*

* "Above all, sedulously cultivate your Vernacular, for it is through the medium of the Vernacular alone that you can hope to reach the masses of your countrymen."

মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত লোকশিক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে বঙ্গভাষার সাহায্যেই করিতে হইবে, অন্য কোনও পন্থাই নাই। এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সার আশুতোষের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বঙ্গভাষা (ও অন্যান্য দেশীয় ভাষা) শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হইবে, ইহা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, তাহার প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ এই সম্বন্ধে জনমতকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন। এই সম্মিলনের নাম 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন' রাখা হয়। বঙ্গের বাহিরেও এই সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ১৩১৩ সালে (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) কাশিমবাজার রাজ-বাটীতে আহূত হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশন হয় ১৩২৩ সালে (১৯১৬ খৃষ্টাব্দে) বাঁকিপুরে। এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং সাহিত্য-শাখার সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন হয় ১৩২৬ সালে (১৯১৯ খৃষ্টাব্দে) হাওড়ায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের আদর্শে রঙ্গপুরের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী-প্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টায় 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ সালে সার

আশুতোষ ইহার একটি অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সকল অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণরূপে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে রক্ষিত হইবার যোগ্য। এই সকল সভায় ও অন্যত্র তাঁহার ওজস্বিনী বাণী বাঙ্গালীর সাহিত্য-জীবনে এক নূতন উদ্দীপনা ও প্রেরণা আনয়ন করিয়াছিল।

কৃত্তিবাস ও মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালীর জাতীয় কবি। ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন-উপলক্ষে ও মাইকেলের মৃত্যুদিনের স্মৃতিবাসরে তাঁহার সমাধি-প্রাঙ্গণে সভাপতি-রূপে সার আশুতোষ যে প্রাণময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেও বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কর্ম্মবহুল জীবনের বিবিধ ও বিচিত্র কার্য্য-কলাপের মধ্যে আশুতোষ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। নবযুগের কবিতা—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বিহারীলালের অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত ভাবময়ী কবিতা—তাঁহার অতিশয় আদরের বস্তু ছিল, তাই কোনও বিষয়ে কিছু বলিতে গেলেই ঐ সকল কবির বাণী তাঁহার মুখে আপনি আসিয়া জুটিত, তাঁহার কল্পনাকে আরও স্পষ্ট, ভাষাকে আরও আবেগময়ী, প্রকাশভঙ্গীকে আরও সরস ও দৃপ্ত করিয়া তুলিত। বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন্ কোন্ সাধকের প্রভাব তাঁহার উপর পড়িয়াছিল তাহা এই ভাবে নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন নহে।

এই যে বক্তৃতাগুলি নিবদ্ধ হইয়া 'জাতীয় সাহিত্য' নামে প্রকাশিত হইল, ইহার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে তাঁহার অতুলনীয় স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। এক দিকে

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্বেতদ্বীপের সরস্বতীর পার্শ্বে বাঙ্গালার শ্বেত শতদলবাসিনী বীণাপাণির আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন, অপর দিকে সাহিত্য-সম্মিলন ও অন্যান্য সভার দ্বার দিয়া বাঙ্গালী জাতিকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে আপন অটল আসন স্থাপিত করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী জাতির—বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রের—প্রতি তাঁহার অপরিমেয় বিশ্বাস ছিল। এই বক্তৃতাগুলিতে ভবিষ্যতের যে উজ্জ্বল সম্মোহন চিত্র তিনি কল্পনার নেত্রে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিজেও মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দকেও মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রমেয় বিশ্বাসপূর্ণ, শ্রদ্ধাপূর্ণ ও ভবিষ্যতের আশায় বলিষ্ঠ হৃদয়ের আবেগভরা উচ্ছ্বাসে এই নিবন্ধগুলি এমনই একটি পবিত্র মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে, যাহার তুলনা বঙ্গসাহিত্যে বিরল। তাঁহার অতুলনীয় কর্ম্মশক্তি তাঁহার উচ্ছ্বাসময়ী বাণীকে এক অভিনব সার্থকতার অরুণরাগে উজ্জ্বল করিয়াছে। অন্য কোনও স্বল্পশক্তিসম্পন্ন লোকের মুখে এই বিপুল আশার বাণী মানাইত কি না সন্দেহ।

ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে একটি ঘনিষ্ঠ ভাব-গত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার অদম্য কর্ম্মশক্তি ও অক্লান্ত সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষে এইরূপ এক জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্য দিয়া ভারতের জাতীয় সাহিত্যগুলিকে উন্নত করা, দেশীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ প্রদান করা, ইহাই ছিল

তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে মারাঠী, গুজরাটী, অসমীয়, ওড়িয়া, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার অধ্যাপনা-প্রবর্ত্তনের দ্বারা আশুতোষ তাঁহার উদ্দেশ্য কতটা সফলতার পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রকাশ করিবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

জাতীয় সাহিত্য

ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

মা বঙ্গভারতি !

"তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই;
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,
অভিনব শান্তি-রসে মগ্ন হ'য়ে রই।
যে ক'দিন আছে প্রাণ,
করিব তোমায় ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও-রাঙ্গা চরণতলে ॥"

—বিহারীলাল।

এস মা, এক বার দশভুজার রূপে আসিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-মন্দিরে দাঁড়াও এবং আশার স্নিগ্ধ অঞ্জনে বাঙ্গালীর চক্ষু মাজিয়া দাও; তোমার বরাভয়দায়ী

করস্পর্শে তাহাদের মোহ কাটিয়া যাক, হৃদয়ে বল আসুক, অন্তরের অন্তস্তলে উৎসাহের সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত হোক;—বাঙ্গালী দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া, আত্ম-পর ভুলিয়া, একপ্রাণে, একতানে সঙ্গীত ধরুক,—সে সঙ্গীতে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাক, বাঙ্গালার সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের আসন অধিকার করুক।

একদিন—সেই অতি প্রাচীনকালে—যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মিও জগতে ফুটে নাই,—বিশ্ব যখন একপ্রকার প্রগাঢ় অন্ধতমসে আচ্ছন্ন—সেই আদিকালে—ভারতের আর্য্যাবর্ত্তে যে বেদগান গীত হইয়াছিল, সেই গানে তখনকার ভারতের সর্ব্বত্র,—"পর্ব্বত-পাথার, সমুদ্র-কান্তার" সমস্ত ভরিয়া গিয়াছিল,—সেই এক সঙ্গীতের মধুর আকর্ষণে ভারতবর্ষ যেন একপ্রাণ হইয়া গিয়াছিল,—শ্রৌতযুগের সেই সাহিত্যিক একতা, সেই সঙ্ঘ-বন্ধ ভাব, সেই চিরনবীন প্রেম, সেই বড় স্পৃহণীয় মিলন,—আর কি হইতে পারে না? সে বৈদিক যুগ নাই, সেই বিরাট্ বৈদিক সাহিত্য আজ অলঙ্ঘ্য হিমাচলের ন্যায় ঐ পড়িয়া আছে,—ভারতে আবার সেই সাহিত্যিক একতা, মনীষার সম্মেলন একপ্রকার অসম্ভব, একথা বলিলে চলিবে না। সেই হারানো ধন আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে; বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সেই লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। কালের বশে চলিয়া আমাদিগকে কালজয়ী হইতে

হইবে। বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকগণকে উদাত্ত-কণ্ঠে গাহিতে হইবে—

"কে বলিল পুনঃ পাবে না তায় ?
হারানো মাণিক পাওয়া কি না যায় ?
হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে,
রাহুগ্রস্ত ছায়া ক'দিন রবে ?
এ জগত-মাঝে করো না ভয়,
সাহস যাহার তাহারি জয়;
দেখো না, দেখো না, দেখো না পাছে,
আগে দেখ আর কত দূর আছে ;
ঐ দেখ দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে,—
করহ সাধনা,—পাইবে ফিরে ॥"

—হেমচন্দ্র[১]।

একদিন যেমন বৈদিক সাহিত্য শিক্ষিত ভারত-বাসীর আত্ম-সাহিত্য ছিল, আজ বঙ্গসাহিত্যকে সেইরূপ সমগ্র ভারতের আত্ম-সাহিত্য করিতে হইবে। জানি, এ কথায় হঠাৎ আস্থা স্থাপন করা বড়ই দুষ্কর;—স্বীকার করি, কথায় যাহা বলা যায়, কার্য্যে তাহা পরিণত করা সর্ব্বদা সম্ভবপর নহে,—কিন্তু চেষ্টায় ত দোষ নাই। মানুষের সামর্থ্য যে কত,

এক দল মানুষ অথবা একটা মানুষ যে কত কাজ করিতে পারে, তাহা যদি মানুষ নিজে বুঝিতে পারিত, আত্মসত্তায় যদি মানুষ বিশ্বাস করিতে জানিত, তবে নরজাতির অবস্থা হয় ত আরও বিস্ময়করী হইত, জগৎ মধুময় হইত।

আজ এক বার ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে বঙ্গের মানচিত্র গুটাইয়া রাখিয়া, ভারতের মানচিত্রে দৃষ্টি-সংযোগ করিতে হইবে। কলবাহিনী ভাগীরথার তীরে দাঁড়াইয়া এক বার নর্ম্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর স্রোতে মানস স্নান করিতে হইবে। শ্যামা বঙ্গভূমির কোলে বসিয়া শৌর্য্যবীর্য্যের সমাধিক্ষেত্র রাজপুতানার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে হইবে। কি করিলে, কোন্ পথে চলিলে, আমার বঙ্গভারতীকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাজ-সজ্জায় মনের মত করিয়া বিভূষিত করিতে পারিব, কি করিলে আমার বঙ্গসাহিত্যকে কালে ভারত-সাহিত্যে পরিণত করিতে পারিব, সকল প্রদেশের মনীষাফলে বঙ্গভূমিকে ফলবতী করিতে পারিব,—এই চিন্তা আমাদিগকে করিতে হইবে। আমি বাঙ্গালী যেমন মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞান-গরিমায় আমার মাকে সাজাইতে চাই, তেমনই আবার বাঙ্গালার মনীষা-সম্পদে তৎ তৎ প্রদেশ কি উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে, সে কথাও আমাকে ভাবিতে হইবে। একাকী দীর্ঘপথ চলা বড় দায় ও বিরক্তিজনক, দশজনকে লইয়া—আমার দেশী-

বিদেশী সকল ভাইকে লইয়া—যাহাতে সেই বিরাট্ সারস্বত মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারি, সেই চেষ্টা আমাকে করিতে হইবে। ক্ষুদ্র আপনাকে ভুলিয়া বৃহৎকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অল্পে সুখ নাই, যাহা ভূমা—বিরাট্—তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে।[৩] তবে ত মুক্তি। যত সঙ্কোচ, বন্ধন তত কঠোর; যত প্রসার, মুক্তি তত সম্মুখে। বাহু প্রসারণ করিয়া সমগ্র ভারতকে আলিঙ্গন করিতে হইবে,—আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইবে,—বাঙ্গালায় রামপ্রসাদের "মিঠের লোভে তেতোমুখে সারাদিনটা গেল"[৪]—ক্রন্দনের করুণস্বরে নিদ্রিত গুর্জ্জরের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে, আবার রাজপুতানার ভট্টকবির উৎসাহপূর্ণ সঙ্গীতের সঞ্জীবনমন্ত্রে বঙ্গসাহিত্যের কোমল প্রাণে নবীন আশার আলোক ফুটাইতে হইবে।

অন্যের যাহা ভাল, তাহা আমাকে লইতে হইবে; আমার যদি কিছু ভাল থাকে, তাহা অন্যকে অঞ্জলি পূরিয়া দিতে হইবে। এইরূপ আদান-প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই, পূর্ণত্ব-লাভের সম্ভাবনা নাই। এমন একটি সাধারণ উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যাহার আশ্রয়ে বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, গুর্জ্জর, রাজপুতানা, গান্ধার, পাঞ্জাব—সব এক সূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যের এক সমতটে সমবেত হইতে পারে। বাঙ্গালার শ্যামা-

দোয়েলের কূজনে রাজপুতানার ময়ূর কেকামৃত বর্ষণ করিবে, আবার গান্ধারের দ্রাক্ষারসে বাঙ্গালার সাহিত্য-কুঞ্জ সরস হইবে।) এক কথায়, এমন একটি সুখকর যান আবিষ্কার করিতে হইবে, এমন একখানি মনোহর বজ্‌রা গড়িতে হইবে, যাহার সাহায্যে ভারতের যে প্রদেশে যাহা কিছু উত্তম, মনোজ্ঞ, তাহা অন্য প্রদেশে অবাধে আমদানী করা যাইবে। যাহার যাহা ভাল, সকলেই তাহার আস্বাদ-গ্রহণে সমর্থ হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে কালে—অনন্ত কালের তুলনায় অতি অল্প কালের মধ্যে—ভারতবর্ষে এক অদ্বিতীয় ও অবিচ্ছিন্ন প্রকৃত একাতপত্র সাহিত্য-সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন হইবে। সে যে কি সুখের সাম্রাজ্য, সে যে কি মোহের সাম্রাজ্য, তাহা ভাবিতেও কতই না আনন্দ! এক চিন্তা এক ধ্যান এক জ্ঞান যাহাদের, এক দেবতা এক মন্ত্র এক পূজা যাহাদের, এক গান এক সুর এক তান যাহাদের, তাহাদের আবার অভাব কিসের? যদি এমনই সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারি,—সমগ্রভারত যাহাকে নিজের বুকে তুলিয়া লইবে যদি এমনই রত্ন উদ্ধার করিতে পারি, তবেই ত মায়ের প্রকৃত পূজা করিলাম,—অন্যথা মায়ের অবমাননা মাত্র। এস সাহিত্যিক, এস বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক, এস ভাই বাঙ্গালী; এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরা ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-রাজ্যগুলি এক করিয়া,

এক বিরাট্ সাহিত্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। তুমি-আমি চলিয়া যাইব, আরও কত আসিবে, কত যাইবে, কিন্তু যদি এই ভারতব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারি,—অথবা ইহার বিন্দুমাত্র আনুকূল্যও করিয়া যাইতে পারি, আমাদের মরজীবন সার্থক হইবে। এ জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। আমি একা, আমি দুর্ব্বল, আমি অসহায়, এই সকল মনুষ্যত্ব-ঘাতী চিন্তা পরিহার করিয়া সিংহবিক্রমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, সিদ্ধি নিশ্চিত। মনে রাখিও যদি তোমার সঙ্কল্প-শুদ্ধি থাকে, তবে তোমার সঙ্কল্পের সিদ্ধিও নিশ্চিত। সুতরাং শুদ্ধ-সঙ্কল্পে হৃদয় সবল করিয়া সাহিত্যের সাধনায় প্রবৃত্ত হও। দেখিবে, আজ যাহা ভাবিতেছ স্বপ্ন, কাল তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে,—অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। দেখা যাউক, বাঙ্গালী আমরা এই সাহিত্য-সাম্রাজ্য-স্থাপনে কতটুকু সাহায্য করিতে পারি।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে একটা জিনিষ দেখিতে পাই যে, কি মান্দ্রাজ বোম্বাই, কি গুজরাট বাঙ্গালা,—সকল দেশের শিক্ষিত লোকেই ইংরাজীর দ্বারা পরস্পর কথাবার্ত্তা বা ভাবের আদান-প্রদান চালাইয়া থাকেন। বরোদার এক ব্যক্তি, যিনি বাঙ্গালার কিছুই জানেন না, তিনিও অবাধে ত্রিপুরার এক ব্যক্তির সহিত সুন্দর আলাপ করিতেছেন; পরস্পরের দেশীয় ভাষার অজ্ঞতা-

নিবন্ধন, তাঁহাদের কাহারই কোন অসুবিধা হইতেছে না। বিদেশী ইংরাজী ভাষাই তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘটকতা করিতেছে। এক হিসাবে ইংরাজী আমাদের বহুল উপকার করিতেছে। আজ যে ভারতে জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইয়াছি, তাহা ইংরাজীর প্রসাদে। রাজভাষা ভারতের অনেক উপকার করিয়াছে, করিবেও। সত্য বটে, পাশ্চাত্ত্য ভাবের অনেক স্তর এ দেশের মাটীর সহিত খাপ খায় না, কিন্তু এমন অনেক জিনিষ পশ্চিম দেশের ভাষা আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছে, যাহাতে আমাদের পরম উপকার হইয়াছে। অদৃষ্টবাদী আমরা, কর্ম্ম করিতে শিখিতেছি। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় আমরা কতদূর উপকৃত বা আমাদের দেশীয় ভাষা পাশ্চাত্ত্য ভাষার সম্পর্কে কতটা সম্পন্ন, তাহা অদ্যকার বক্তব্য নহে; অন্য এক উপলক্ষে আমি তাহা বলিয়াছি, সুতরাং আজ সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ ভাবের রাজ্য,—প্রাণের রাজ্য। ভারতের কোন প্রদেশেই ভাবের অভাব নাই। মনস্বী মহাজনের অভাব নাই। উদ্ধবদাস-সুরদাস, রামপ্রসাদ-চণ্ডীদাস, মীরা-তুলসীদাসের ভারতে অভাব নাই। কেহ লোক-লোচনের সম্মুখে আসিয়াছেন, কেহ-বা পল্লীকুঞ্জের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় জীবন কাটাইয়াছেন,—দেশান্তরের লোকে তাঁহাকে চিনিবার অবসর পায় নাই। ভারতবর্ষের

সকল প্রদেশেরই এক একটি নিজস্ব ভাষা আছে এবং তাহা অতি প্রাচীন। সেই সমস্ত প্রদেশের অনেক অমর কবি, অনেক নিপুণ লেখক সেই সেই ভাষায় কত সুমধুর কাব্য, কত সুমধুর কথাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এখনও লিখিতেছেন,—তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সেই দেশের অধিবাসীরা তৎ তৎ মহাকবির কাব্যামৃত-পানে কৃতার্থ হইয়াছে। ধরুন—যেমন কৃত্তিবাস বা চণ্ডীদাস, মাইকেল মধুসূদন বা হেমচন্দ্র, বঙ্কিম বা দীনবন্ধু[৭]। কে এমন বাঙ্গালী আছেন, যিনি ঐ সকল মহাকবির কাব্য পাঠ করিয়া, নিজে ঐ সকল কবির স্বজাতি বলিয়া শ্লাঘা অনুভব না করেন? বাঙ্গালার এমন কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তির গৃহ আছে, যেখানে ঐ সকল কবির কোন-না-কোন গ্রন্থ গৃহের শোভাবর্দ্ধন না করিতেছে? ঐ প্রকার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথাও ভাবুন। প্রত্যেক প্রদেশেই তাহার "নিজস্ব" বলিয়া কিছু-না-কিছু আছেই। ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশে এখনও নূতন, এখনও ত্রিশকোটী[৮] ভারতবাসীর মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন মাত্র ইংরাজী ভাষার অনুশীলন করেন। যাহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষ, যাহাদিগকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট, সেই সাধারণ জন-সমাজ এখনও ইংরাজীর অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয় নাই। আমার মনে হয়, তাহাদিগকে—সেই বিপুল জনসঙ্ঘকে—সাহিত্যের

ভিতর দিয়া যদি এক করিতে পারা যায়, তবেই ভারতে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, অন্যথা নহে। এখন এমন একটি সাধারণ সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যাহার উপর দিয়া ভারতের সকল দেশের অধিবাসীরা তাহাদের সর্ব্ববিধ বাধা-বিপত্তি পার হইয়া এক মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে। সকলে সাহিত্যের অঙ্গনে এক হইবে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই থাকিবে না। অবশ্য কথা বড়ই কঠিন। দেখা যাক, ইহার সমাধান হয় কি না।

ভারতবর্ষে এখন সাধারণতঃ শিক্ষার কেন্দ্র দেখিতে পাই প্রকৃত পক্ষে একটি; তাহা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন যত কিছু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, ক্রমে তাহা লোপ পাইতেছে, যাহা আছে, তাহাও যায়-যায়। নবীনের সঙ্ঘর্ষে সে প্রাচীন পদ্ধতি ক্রমেই হটিয়া যাইতেছে। আর তাহার পুনরুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। এখন আর সে তেঁতুলের পাতার ঝোলে চতুষ্পাঠীর ছাত্র নির্ভর করিতে চায় না, বা অধ্যাপকও নির্ভর করাইতে পারেন না। সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সব ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছে। এখন শিক্ষা বলিতে সাধারণতঃ লোকে বোঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, উচ্চশিক্ষিত বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। অভিভাবক এখন স্ব স্ব বালকদিগকে স্কুলকলেজে পাঠাইতে পারিলেই তাঁহাদের শিক্ষার সম্বন্ধে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল মনে

করিয়া থাকেন। দেশের সে চৌপাড়ি পাঠশালা ক্রমেই লোপ পাইতেছে, গ্রামে গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। শিক্ষা-সমাপ্তির পর যে কি হইবে, কোন্ পথে যাইতে হইবে,—সে সব চিন্তা না করিয়া ছেলেদিগকে স্কুলকলেজে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহার ফল ভাল কি মন্দ,—এই ভাবে দেশের শিক্ষাপদ্ধতি চলিলে কোথায় যাইয়া যে ইহার কি পরিণাম দাঁড়াইবে, তাহা গুরুতর চিন্তার কথা। সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণ যে শিক্ষার উপর নির্ভর করে, সেই শিক্ষা এই বর্ত্তমান প্রণালীতেই হওয়া উচিত, না অন্য কোন সমীচীন পথে শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হওয়া বিধেয়,—সে বিষয় অদ্য আলোচ্য নহে। স্থানান্তরে সে কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহা বলিতেছিলাম—শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে সবে সাত-আটটি বিশ্ববিদ্যালয়[১০] আছে মাত্র। কিন্তু সে দিন আর দূরে নহে, মনে হয়, যখন ভারতের এক এক প্রদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে পাইব। যখন বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়া দেশে আর অন্য কোন শিক্ষার কেন্দ্র নাই বা থাকিলেও তাহা গণনার মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদল-বদল করিতে হয়, বা নূতন কিছু করা দরকার হয়, তবে তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। অন্যথা,

একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত ব্যবস্থা থাকিতে, এখন আবার নূতন করিয়া আর একটা পথ খুলিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। সুতরাং ভারতের সাহিত্যিক একতার সমাধান যদি করিতেই হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যেই করিতে হইবে। চাই আমরা কাজ,—যে ভাবে যত সহজে সেই কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারি, তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। সংজ্ঞা লইয়া বিতণ্ডা করিলে চলিবে না, সংজ্ঞিত পদার্থ-প্রাপ্তির সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে হইবে। নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। ভগবানের নাম করিয়া, দেশ-মাতৃকার চরণ স্মরণ করিয়া, বঙ্গভারতীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া, আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব,—মায়ের ছেলে আমরা—"মা মা" রবে অগ্রসর হইব, সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়া যাইবে। সভ্য মহোদয়গণ, আজ আমরা সকলেই এক সঙ্কল্পে, এক উদ্দেশ্যে এই পবিত্র সারস্বত সম্মেলনে সমবেত হইয়াছি; আজ গৈরিকস্রাবের ন্যায় আমার হৃদয়ের ভাবপ্রবাহ আপনাদের সম্মুখে ছুটিতে চাহিতেছে,—আত্মগোপন করিতে আমি জানি না, কোন দিন করিও নাই। বিশেষতঃ আজ—এমন পবিত্র দিনে—মাহেন্দ্রক্ষণে মনের কবাট খুলিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছে যে,—ঐ দেখুন, আমার হৃদয়ে আমি ভারতের কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি! এক ভাব, এক ধ্যান, এক জ্ঞানে একতাবদ্ধ হইয়া, এক

পরিবারের মত ভারতবাসীরা,—হিন্দুমুসলমান, পার্শি-খৃষ্টান,—সকলে সর্ব্ববিধ মনোমালিন্য ভুলিয়া, জাতিভেদ ভুলিয়া, বীণাপাণির মন্দিরে সমবেত হইয়া, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মায়ের পদে,

"সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ" [১১]

বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিতেছে! বাঙ্গালার

"হৃদিবৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি,
ওহে ভক্তপ্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।" [১২]

সঙ্গীত আমি যেন শুনিতে পাইতেছি,—ঐ শুনুন,—ভারতের অপর প্রান্তে,—সুদূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; বাঙ্গালার শ্যামার ঔদাস্যপূর্ণ সঙ্গীত ঐ যেন রামেশ্বরের সিন্ধুতীরে মূর্চ্ছিত হইতেছে! আবার ঐ শুনুন,—মহারাষ্ট্রের মধুর গীতলহরী বাঙ্গালাভাষার মধ্য দিয়া আসিয়া বঙ্গের প্রতিপল্লী মাতাইয়া তুলিতেছে। আমি যেন দেখিতে পাইতেছি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্ব স্ব দেশের ভাষার যে ব্যবধান বা প্রাচীর ছিল, যাহার জন্য বাঙ্গালী কৃষক বা পল্লীবাসী উৎকলের বা দ্রাবিড়ের পল্লী-সঙ্গীত বুঝিতে পারিত না, পরস্পরের ভাবের বিনিময়—সুতরাং প্রাণের বিনিময়—করিতে পারিত না, সেই ব্যবধান-প্রাচীর যেন ধূলিসাৎ হইয়াছে। এখন আর "পর পর" ভাব নাই, সব এক হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালীর কণ্ঠে গুর্জ্জরের কণ্ঠ মিশিয়া এক অভূতপূর্ব্ব, স্বপ্নময় সঙ্গীতের প্রস্রবণ ছুটাইতেছে।

আমি অনেক দূরে ভাসিয়া আসিয়াছি। এখন প্রস্তুতের অনুসরণ করি।[১৩] বলিতেছিলাম, আমরা চেষ্টা করিব ভারতে যে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহাদের সাহায্যে একটা ভাবগত একতা স্থাপন করিতে পারি কি না। আমি এ বিষয়ে খুব আশ্বস্ত। ভারতবাসীর একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও আত্ম-সমর্পণের কথা যখন মনে করি, তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, ভারতবাসীরা কোন কাজে অসমর্থ,—তা সে কাজ যতই দুষ্কর বা আয়াসসাধ্য হউক না কেন! পারাঞ্জপে-গোখ্‌লে-রানাডে, রামমোহন-রবীন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র, প্রফুল্ল-জগদীশ-রাসবিহারী, বিবেকানন্দ-সুরেন্দ্রনাথ-সুব্রহ্মণ্য[১৪] প্রভৃতির দিকে যখন তাকাই, তখন আশায় আমি উৎফুল্ল হই। এ পর্য্যন্ত এমন কোনও কাজ ত দেখিলাম না, যাহা কঠোর বা অসাধ্য বলিয়া ভারতবাসী ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদের নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হইবার কোন কারণ নাই। কাজ করিতে আসিয়াছি, করিয়া যাইব। (সঙ্কল্পে যদি দোষ না থাকে, মনে যদি কলঙ্ক না থাকে, শত সহস্র মত্ত ঐরাবতেও আমাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিবে না, মানুষ ত কোন্ ছার।) এ সংসারে কেহ কাহাকেও কিছু করিয়া দেয় না, প্রকৃত পক্ষে দিতে পারে না। "Friends

and patrons cannot do what man himself should do"—কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—সত্য কথা। শুধু দৈহিক বল নহে,—দৈহিক বলের সামর্থ্য অতি অল্প,—মানসিক বল চাই। মনের বলে বলীয়ান্ হও, দেখিবে বিশ্ব তোমার সমক্ষে অবনত। একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া সিংহের ন্যায় দাঁড়াও, দেখিবে জগৎ তোমার বশংবদ। কৈ, বনের পশু সিংহকে ত কেহ রাজপদে অভিষিক্ত করে না, সে কিন্তু নিজের মনের বিক্রমে সমগ্র পশুজাতির উপর রাজত্ব করিয়া থাকে।

> নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে।
> বিক্রমৈর্জ্জিতসত্ত্বস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা ॥
> একোঽহমসহায়োঽহং ক্ষীণোঽহমপরিচ্ছদঃ।
> স্বপ্নেঽপ্যেবংবিধা চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে ॥ [১৫]

সুতরাং

> "কিসের দৈন্য, কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা,
> কিসের ক্লেশ ?" [১৬]

একবার ঐক্য-বদ্ধ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও,—দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের ন্যায় এক দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্রতানুষ্ঠান কর,—সাফল্য নিশ্চিত। এই আশায় বিমুগ্ধ হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই অপরাহ্ণকাল পর্য্যন্ত আমি কত-

কি-না ভাবিতেছি! আমি রাজনীতির কথা বলিতেছি না,—কেন না, যাহাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, যাহাদের প্রকৃত একতা নাই, যাহাদের জাতীয় ভাব-গত ঐক্য নাই, যাহাদের চিন্তার ধারা একই খাতে প্রবাহিত নহে,—তাহাদের পক্ষে রাজনীতি-চর্চ্চা আপাততঃ উত্তেজনা-জনক হইলেও পরিণতিতে চিত্তে অবসাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমি বলিতেছি,—শিক্ষার কথা, দীক্ষার কথা, ভাব-গত একতার কথা। স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া, যাহার যাহা আছে তাহা বজায় রাখিয়া, কি করিয়া ভারতে এক ভাব, এক চিন্তা, এক সাহিত্যের সৃষ্টি করা যাইতে পারে,—কি করিয়া সমগ্রভারতে এক জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, তাহাই আমার বক্তব্য। বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরে পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সুন্দর, নির্ম্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া ক্রমে, ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে, ইহাই আমার বক্তব্য। তাই বলিতেছিলাম, আমাদিগকে নিপুণভাবে দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে এই ভাব-গত, জাতীয় সাহিত্য-গত একতার সমাধান করিতে পারি।

যদি এই মহৎ কার্য্যের—এই দুঃসাধ্য কার্য্যের—সু-সম্পাদনের কোনও উপায় থাকে, তবে তাহা আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি

আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি যাহাতে বিদ্যার্থীরা, প্রথমতঃ ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কৃতিত্ব-লাভের পর, ভারতীয় কতিপয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে; বি. এ., এম. এ. উপাধিমণ্ডিত বাঙ্গালী যুবক দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া, বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে আরও দুই-একটা ভারতীয় ভাষা—হিন্দি বা মারাঠী, উর্দ্দু বা তৈলঙ্গী ভাষা শিক্ষা করিবে, তাহা হইলে শিক্ষা-সমাপ্তির পর, সেই সকল যুবক পরকীয় ভাষার অর্থাৎ ঐ হিন্দি বা মারাঠী ভাষার সম্পদ্-সৌষ্ঠব ক্রমে বঙ্গভাষায় অনুক্রমিত করিয়া বঙ্গ-ভাষার সম্পদ্ বর্দ্ধিত করিতে পারিবে। (যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় মহারাষ্ট্র উন্মত্ত, যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় হিন্দুস্থান আপনার ভাবে আজও আপনি নৃত্য করে, তাহারা সেই উন্মাদনা বঙ্গ-ভাষার শিরায় শিরায় বহাইতে পারিবে।) বঙ্গের ধোয়ী, উমাপতি, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধন[১১] আর বাঙ্গালা ভাষাতেই "অন্তরীণ" থাকিবেন না, ভারতের বিভিন্ন দেশের ভাষাতেও তাঁহাদের মধুর বংশীরব শ্রুত হইবে।

শুধু এক প্রদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রীতির প্রবর্ত্তন করিলে চলিবে না। ক্রমে ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই এই ভাবে দেশীয় ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোম্বাই-মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব-এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেশীয় ভাষায়

এম. এ. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, নতুবা মাত্র বঙ্গে করিলে এই পারস্পরিক "রেসিপ্রোক্যাল" ফলের সম্ভাবনা অতি অল্প। যদি এই ভাবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই দেশীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে প্রতিবর্ষে আমরা এমন দুই-চারি জন শিক্ষিত ব্যক্তি পাইব, যাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা ছাড়া ভারতের অপর দুই-চারিটি ভাষাতেও সুপণ্ডিত। এইরূপে কিছুকাল পরে—বিশ পঁচিশ কি পঞ্চাশ বৎসর পরে—আজ যেমন ইংরাজীতে বি. এ., এম. এ.-র অনেক লোক পাইতেছি, সেই প্রকার স্বীয় মাতৃভাষা ত আছেই, তাহা ছাড়া, দেশীয় অপরাপর ভাষাতেও সুপণ্ডিত লোকের অভাব থাকিবে না। ফলে দাঁড়াইবে এই, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, মতি-গতি সমস্ত ক্রমে এক হইতে আরম্ভ করিবে। এক দেশের যে সাহিত্য উত্তম, এক দেশের যে কবিতা উত্তম, এক দেশের যে লেখায় দেশবাসী ধন্য তাহা অন্য দেশের ভাষায় প্রবিষ্ট হইবে।

সুগম, সরল পথ প্রস্তুত করিতেই যত পরিশ্রম, একবার পথ প্রস্তুত হইলে, যদি সে পথে আপদ্‌বিপদ্‌ না থাকে, তবে চলাচল করার লোকের অভাব কোন দিনই হয় না। (এখন ভারতবর্ষে এই ভাবে জাতীয় শিক্ষার কোন বিশিষ্ট পথ নাই; যাহা আছে তাহা সমস্তই লুপ লাইনের মত বাঁকা পথ।) এখন

আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে কর্ড, ক্রমে গ্রাণ্ড্-কর্ড্, ও পরে গ্রেট্-গ্রাণ্ড্-কর্ড্[১৮] নির্ম্মাণ করিতে হইবে। (জানি, এ পথ তৈরি করিতে অনেক ডাইনামাইটের প্রয়োজন, অনেক উত্তুঙ্গ পাহাড় উড়াইয়া দিতে হইবে, অনেক টানেল নির্ম্মাণ করিতে হইবে,—) কাজ বড়ই আয়াস-সাধ্য। কিন্তু তা বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? তপস্যায় কি না হয়? (অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ যে দেশের সাহিত্যের চিত্র, প্রহ্লাদের সমক্ষে স্ফটিক-স্তম্ভে নরসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব যে দেশের চিত্র, মৎস্যচক্র-ভেদ যে দেশের চিত্র, সে দেশে অসাধ্য কি?) সে দেশে অবসাদ কিসের? প্রারম্ভের পূর্ব্বেই যত হিসাব-নিকাশ, যত ইতস্ততঃ; একবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে, যদি মনের বল থাকে, তবে ষ্টিম রোলারের মত, সমস্ত উচ্চনীচ সমান করিয়া চলিয়া যাওয়া বেশী কথা নহে। তোমার পিতৃপিতামহের নিত্য জপের মন্ত্র একবার স্মরণ কর—

"একো বলবান্ শতং বিজ্ঞানবতামাকম্পয়তে,
বলেন বৈ পৃথিবী জিতা বলং বাবতিষ্ঠস্ব।"[১৯]

এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দিন পরে ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই এম. এ. পরীক্ষার্থিগণকে প্রধানতঃ এক মূল ভাষায় ও তাহার সহিত অন্ততঃ একটি ভিন্নপ্রদেশের

ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে; অর্থাৎ যিনি প্রধানতঃ বাঙ্গালা ভাষা লইবেন তাঁহাকে সেই সঙ্গে হিন্দি বা মারাঠী বা তেলেগু বা গুজরাটি লইতে হইবে,—এইরূপ যিনি মারাঠী ভাষা লইবেন তাঁহাকে সেই সঙ্গে আর একটি ভাষা লইতে হইবে।—যদি যথার্থ অধ্যবসায়শীল উদ্যম-সম্পন্ন কর্ম্মঠ যুবক পাওয়া যায়—অন্ততঃ বৎসরে একটিও মিলে—তবে দশ বৎসর পরে বাঙ্গালায় এমন দশ জন শিক্ষিত ব্যক্তিও পাইব, যাঁহারা অবাধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় যে সমস্ত অমূল্য রত্ন আছে, তাহা আনিয়া প্রতিভার সাহায্যে বঙ্গভাষা খচিত করিতে পারিবেন, বাঙ্গালার সম্পদ্ অনেক বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে যদি ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও দেশীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে বাঙ্গালার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলাম, তাহা সেই সেই দেশের পক্ষেও খাটিবে। ফলে, সমগ্রভারতবর্ষে একটা ভাব-গত একতার সাড়া পড়িবে। পরস্পরের আদান-প্রদানের সুবিধা হইবে। অদূর ভবিষ্যতে, যাহারা ইংরাজী জানে না, ইংরাজী শিক্ষার সুবিধা পায় নাই, কিন্তু দেশীয় ভাষা জানে, তাহারাও ভিন্ন দেশের মনোহর ভাব-সম্পদ্ উপভোগ করিতে পারিবে। জনসাধারণের মধ্যে একটা ঐক্য-বন্ধনের সূত্রপাত হইবে। তখন আর দ্রাবিড়বাসীকে ইংরাজীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে না। নিজের

নিজের মাতৃভাষায় অপর প্রদেশের কবিত্বসৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাহারা কৃতার্থ হইবে।

বঙ্গের সুলেখক হারানচন্দ্র বঙ্গভাষায় সংক্ষেপে মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যাবলীর কতকটা ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন,—ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া কি উক্ত কবিবরের কাব্যসৌন্দর্য্যের কতকটা উপভোগ করেন নাই? নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের ম্যাক্‌বেথের নাটকাকারে অনূদিত গ্রন্থ পড়িয়া ও অভিনয় দেখিয়া কে না শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিল? বিদেশীয় কবির বিদেশীয় ভাষায় লিখিত বিদেশীয় ভাবে পরিপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র পাঠেই যদি এতটা তৃপ্তি হয়, তবে স্বদেশীয় ভাষায় লিখিত স্বদেশীয় কবির গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিজ মাতৃভাষায় পাঠ করিলে কতটা আনন্দ জন্মিতে পারে, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য। অবশ্য আমার এই মতই যে অবিসংবাদী, ভ্রমপ্রমাদশূন্য, তাহা আমি বলিতে চাহি না, কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে এইরূপই একটা প্রণালীতে প্রথম সূত্রপাত করিতে হইবে। আমি জানি, আমার এই প্রস্তাব কর্কশ সমালোচনার হাত এড়াইতে পারিবে না; আমি জানি, এই প্রস্তাবের উপর নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনা উঠিতে পারে,—আবার সেই সঙ্গে আমি ইহাও জানি যে, কে কি বলিবে ভাবিয়া কোন কাজ করিতে গেলে আর কাজ করা হয় না।—

"সুদুর্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ।" ২০

এই কবি-বাক্য আমি বিস্মৃত হই নাই। আমার জীবনের চিরদিনের 'মটো'—

"ধিয়াত্মনস্তাবদচারু নাচরং
জনস্তু তদ্বেদ স যদ্বদিষ্যতি।"[২১]

—আমাকে সর্ব্বদাই সবল করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। যদি কোন মনস্বী এই প্রস্তাবের উৎকর্ষ-বিধানের অনুকূল কোন প্রস্তাব করেন, সাদরে গ্রহণ করিব। নূতন পথে অনেক আবর্জ্জনা থাকিয়া যায়, অনেক কণ্টক প্রথম চোখ এড়াইয়া যায়, ক্রমে চলাচল করিতে করিতে তাহার উদ্ধার হয়। সুতরাং সাঁতার না শিখিয়া সাঁত্রাইব না,—এই বুদ্ধি ভাল নহে। ও-পারের ঐ সুন্দর নন্দনবনে যাইতে হইলে বাহুতে ভর করিয়া সাঁতার শিখিতে হইবে। দু'চার বার হয়ত হাবুডুবু খাইবে, তাহাতে নিরাশ হইও না,—ভরসায় বুক বাঁধিয়া সাঁত্রাইয়া যাও, পারে পোঁছিতে পারিবে। তখন তোমার সকল ক্লান্তি—সকল শ্রান্তি দূর হইবে। শ্যামল বনানীর স্নিগ্ধ অঞ্চলে তুমি আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িবে।

এ স্থলে একটা তর্কের মীমাংসা আবশ্যক মনে করি। তাহা এই—এ দেশে আজকাল ইংরাজীর বহুল প্রচার হইয়াছে। জ্ঞানের জন্যই হউক, আর উদরের জন্যই হউক, অথবা আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই হউক,—সকলেই অল্পবিস্তর ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া থাকে।

এরূপ ক্ষেত্রে আবার নূতন করিয়া এই ভারতীয় ভাষার প্রচলনের প্রয়াস কেন? যে কার্য্যসাধনের জন্য এই প্রয়াস, সেই কার্য্য বা সেই উদ্দেশ্য ত অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ইংরাজীতেই হইতে পারে, তবে এ শিরোবেষ্টন-পূর্ব্বক নাসিকা-স্পর্শ কেন? ইহার উত্তরে আমার মাত্র দুইটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম কথা—জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয়-সাহিত্য-গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য্য। দশভুজার পাদপদ্মে রক্ত জবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপদের অযোগ্য। ইহার অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না।

দ্বিতীয় কথা—ইংরাজী ভাষা অর্থকরী হইলেও ভারতের অধিকাংশ লোক—ইতরসাধারণ—তাহা জানে না, বা এখনও জানিবার জন্য তাহাদের প্রাণে তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নাই। সুতরাং ইংরাজীর সাহায্যে তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস করা বৃথা। যদি তেলেগু ভাষায় বা উৎকলীয় ভাষায় বাঙ্গালার রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের ভাব-সম্পদ্ ফুটাইতে পারা যায়, তবে ইংরাজীতে যতটা ফললাভের আশা করা যায়, তদপেক্ষা ফল যে লক্ষগুণ অধিক হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তুলসীদাসের রামায়ণ ইংরাজীতে তরজমা করিয়া আমরা কয়জনে পড়িয়া থাকি বা পড়িয়া

প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারি? তাই আমার মনে হয়, জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইলে—সকলকে এক অদ্বিতীয় জাতীয়তার সূত্রে গাঁথিতে হইলে, জাতীয় সাহিত্যে একতা-বন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির ভাবের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা স্ব স্ব জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া করিতে হইবে। উচ্চশিক্ষিত হইতে নিরক্ষর কৃষককুল পর্য্যন্ত এক ঊর্ণনাভের জালে বেড়িয়া ফেলিতে হইবে, অন্যথা একীকরণ অসম্ভব। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে, এখন যে খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-রাজ্য আছে তাহা এক বিরাট্ সাম্রাজ্যে পরিণত হইবে। সমস্ত ভেদ মিটিয়া গিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুখময়, স্বপ্নময় সঙ্ঘের গঠন হইবে। তবে এই মহৎ কার্য্যে মহা ত্যাগ চাই। বড় জিনিষ পাইতে হইলে খুব বড় রকমের ত্যাগ আবশ্যক। যদি আমাদের সেই ত্যাগের সময় আসিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, সে দিন আর দূরে নহে,—যখন ভারতের এক প্রান্তের একটি সঙ্গীতে অপর প্রান্তের প্রতিপল্লী সাড়া দিবে। আহা, সে অবস্থার কল্পনাতেও আমার কত-না সুখ, কত-না আনন্দ!

অবশ্য যে প্রণালীতে আমি ভারতীয় ভাষার আলোচনা করিতে বলিলাম, তাহাতে ঠিক ভাষা-গত একত্ব সংঘটিত হইবে না বটে, কিন্তু ভাব-গত একত্ব সাধিত হইবে। ক্রমে সমগ্রভারতে একই ভাবের বন্যা বহিবে। যদি একবার সেই ভারত-প্লাবিনী বন্যার

আবির্ভাব হয়, তখন সকল অবসাদ, সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। পরস্পরের সুখদুঃখের অংশীদারের অভাব থাকিবে না। একের কান্নায় অপরে কাঁদিবে, একের অভ্যুদয়ে অপরে আনন্দিত হইবে। Unification of language না হউক, unification of thought and culture নিশ্চয়ই জন্মিবে। সুতরাং সমগ্রভারতের সকল কেন্দ্রে, সকল পল্লীতে এক স্রোত প্রবাহিত হইবে। মরুভূমিও তখন সরস হইয়া উঠিবে!—ইহা আমার স্বপ্ন নহে।

কেহ কেহ বলেন, সমগ্রভারতে এক ভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেন-না ভাষাভেদে মনোভেদ, সুতরাং মতভেদ অনিবার্য্য। তাই তাঁহাদের মতে অন্ততঃ হিন্দি ভাষা সমগ্রভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

আমি কিন্তু এ মতের সমর্থন করিতে পারি না। যে কারণে ইংরাজী ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অন্য কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্ব্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা-রূপে গৃহীত হইলে যেমন প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে, সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্রভারতের ভাষা করিতে গেলেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য

বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে। যে মধুরতার জন্য, যে প্রসাদগুণের জন্য, যে মনোহারিতার জন্য বাঙ্গালা ভাষা এত স্পর্দ্ধার বস্তু, তাহা ক্রমে সিকতারাশিতে বারিবিন্দুর ন্যায় কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে!

অন্য প্রদেশের সম্বন্ধেও এই একই কথা। সুতরাং আমার মতে, যে প্রদেশে যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত, তথায় তাহা সেইরূপই থাকুক,—সেই ভাষায় সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্য ক্রমে বর্দ্ধিত হউক,—শ্রীসম্পন্ন হউক। সে পক্ষে কোন বাধার প্রয়োজন নাই। কেন-না যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহার বড়ই দুর্ভাগ্য। জগতে তাহাদের স্থান অতি অল্প; কালের অক্ষয় শিলা-ফলকে তাহাদের কথা ক্ষোদিত থাকে না। তাহারা প্রাতঃকুজ্ঝটিকার ন্যায় অচিরকাল-মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়! সুতরাং তাহাদের জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া অন্য প্রদেশবাসীদিগকেও সেই ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হউক। প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সম্পন্ন হইয়াও অন্য প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রহণ-যোগ্য, তাহা স্ব স্ব ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউক। এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পরে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা, এবং ক্রমে মনের একতা জন্মিবে। নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও এক ভাবে ভাবিত হইয়া ভারত একই লক্ষ্যের

দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের জাতীয় সাহিত্যের ধারা যাহাতে প্রতিহত হয়, দেশ-হিতৈষী কোন ব্যক্তিরই তাহা করা উচিত নহে। আপনার ধর্ম্মে আপনিই যাহা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, তাহাকে ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্য বিরূপ করা কোন মতেই যুক্তি-সঙ্গত বা নীতি-সঙ্গত নহে।

আমার বক্তব্য ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে;—আমার মনে এত ভাব আসিতেছে, কল্পনা আমাকে এত দূর-দূরান্তরের মনোহর দৃশ্য দেখাইতেছে যে, আমি আত্মসংযম বা আত্মগোপন করিতে পারিতেছি না,—আর আমি আত্মগোপন করিতে শিখিও নাই। তথাপি অদ্যকার এই সাহিত্যের 'মহা-সম্মিলনে' আমি আর আপনাদিগকে বিরক্ত করা সঙ্গত মনে করি না। আমি সাহিত্যসেবী নহি; বঙ্গসাহিত্যের সেবক বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার আমি অধিকারীও নহি, তথাপি ভালবাসিয়া আপনারা আমাকে যে অদ্যকার এই গৌরবের আসন প্রদান করিয়াছেন, সে জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

উপসংহারে বক্তব্য, বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, দলাদলি, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভুলিয়া আপনারা এক মনে, এক প্রাণে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হউন। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। এখনও মনে মন মিশাইয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, দুর্ব্বলকে

কোলে তুলিয়া, সকলকে আপন করিয়া লইয়া এক পথে, এক যোগে যাত্রা করুন,—মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার সময়ে মনে মালিন্য রাখিতে নাই। ব্রতানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সংযম করিতে হয়, ইহা আপনাদেরই শাস্ত্রের আদেশ। বহিঃসংযম অনাবশ্যক, হৃদয়ের সংযম করিয়া বাগ্‌দেবতার মন্দিরের সম্মুখীন হউন,—এই আমার প্রার্থনা। মন্দির-প্রবেশের পূর্ব্বে কেবল হস্তপদাদি নহে, হৃদয়ও প্রক্ষালিত করুন,—এই আমার সবিনয় নিবেদন। মনে রাখিবেন,—এই বিংশ শতাব্দীতে জগতের গতি যে দিকে আপনাদিগকেও সেই দিকে যাইতে হইবে। কেন-না আপনারা জগৎ-ছাড়া নন। যাহা আজ স্বেচ্ছায় করিতে অনিচ্ছুক, কাল বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হইবে। ভগবানের

"কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।" [২২]

বাক্য বিস্মৃত হইবেন না; আর সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিবেন যে,—

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥" [২৩]

সভ্যগণ! স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে ভারতবর্ষের যে প্রাধান্য, বাহুবল তাহার কারণ নহে, জ্ঞানবল তাহার কারণ। দুঃখিনী ভারতভূমির সে শিক্ষা-দীক্ষা ক্রমে

মন্দীভূত হইতেছে,—মায়ের আমার অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। এখনও রোগের প্রতিকারের সময় আছে, বদ্ধপরিকর হইয়া আবার ভারতভূমিকে সেই বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানললামে বিভূষিত করুন। ত্রিশ কোটী কণ্ঠে একবার তারস্বরে "মা" বলিয়া ডাকুন,—মায়ের আসন টলিবে, মা মুখ তুলিয়া চাহিবেন। তখন আবার নবীন ঊষার বর্ণচ্ছটায় ভারত রঞ্জিত হইবে, অজ্ঞান-অবিদ্যার অবসাদ কাটিয়া যাইবে। হৃদয়ে বল করিয়া স্মরণ করুন—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"[২৪]

কিসের অবসাদ? কিসের সংশয়? কিসের সঙ্কোচ?

"কবি-রঙ্গভূমি এই না সে দেশ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে,—যেখানে দিনেশ
অতুল ঊষাতে উদয় হয়?
যেখানে সরসী-সলিলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ-চাঁদের চাঁদিনী
গগন-ললাট ভাসায়ে রয়?

তবে মিছে ভয়, কেন রে সংশয় ?
গাওরে আনন্দে পূরা'য়ে আশয়,—
যেরূপে মায়েরে কমল-আসনে,
দিয়া শতদল রাতুল চরণে,
অমর পূজিলা নন্দনবনে

—হেমচন্দ্র

কৃত্তিবাস

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে তোর কেন আজি ?"
—মাইকেল মধুসূদন। ২০

ব্যাস, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস—সামান্য প্রণিধান-সহকারে দৃষ্টি করিলেই যেমন উপলব্ধি হয় যে, যে সকল সংস্কৃত কাব্য কোনও ঋষি কর্তৃক বিরচিত নহে, তাহাদের অধিকাংশের উপরেই ব্যাস বা বাল্মীকির প্রভাব পরিস্ফুট। কেহ মহর্ষি ব্যাস-বিরচিত কবিতা-কুঞ্জের পথিক, কেহ-বা রত্নাকরের নানারত্নসমুদ্ভাসিত কবিতা-মন্দিরের যাত্রী; ব্যাস বা বাল্মীকির কাব্যের আদর্শ যেমন পরবর্ত্তী অনার্য্য কবির কাব্যের উপজীব্য, তদ্রূপ বাঙ্গালার মহাকবি কৃত্তিবাসের প্রভাব—তাঁহার ভাষার প্রভাব, ভাবের প্রভাব, রচনাভঙ্গির প্রভাব—তৎপরবর্ত্তী বঙ্গীয় কবিকুলের উপর সম্যক্ রূপে সুপরিস্ফুট। কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী কবিবৃন্দ যে সমুদয় সুরভিকুসুমে বীণাপাণির

পাদপূজা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই কৃত্তিবাসের কবিতারূপ কল্পনা-কানন হইতে সংগৃহীত। এই হিসাবে সংস্কৃত কাব্যাবলীর সহিত ব্যাস-বাল্মীকির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার কাব্যাবলীর সহিত কৃত্তিবাসেরও সেই সম্বন্ধ।

কালিদাস ও কৃত্তিবাস—আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস আবার সেই রামচরিতেরই পুনরায় বর্ণনা করিলেন। রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশও শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য। কালিদাসের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে রামায়ণ ভারতের সকল সমাজে কীর্ত্তিত, গীত, অধীত ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইত। তথাপি কালিদাসের রঘুবংশ ভারতের বিদ্বদ্‌বৃন্দ সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার হেতু কি? একান্ত সুপরিচিত ও সর্ব্বদা শ্রুত বৃত্তান্তের পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার একমাত্র কারণ কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের সুস্পষ্টতা। যদি ভাষা এত সুন্দরী এবং সম্পদ্-শালিনী না হইত, তাহা হইলে কেবল ভাবের তরঙ্গলীলায় বা কল্পনার ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য সুধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না। কল্পনা-বিষয়ে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের তুলনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবুও যে কালিদাস এত প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সুমধুর ভাষা। কালিদাস

ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কাব্যাদি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ জন-সমাজে রঘুবংশাদির ন্যায় আদৃত হয় নাই। এই আদর-অনাদরের একমাত্র কারণ ভাষাগত প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতা। কালিদাস এমন মনোহারিণী ভাষায় তদীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন যে, যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক না কেন, বিমুগ্ধ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য গঠিত, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ইহার একতরের উদ্দেশ্যে যে ভাষা গ্রথিত, তাহা কদাচ স্থায়ী বা সর্ব্ববাদিসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। সেরূপ ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থাদি কখনও কালজয়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের তরঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায়; অল্পকাল মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে, সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা-ধমনী-কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে "আমার" বলিয়া গ্রহণ

করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন,—শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলে সমান ভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস সর্ব্বতোগামিনী, সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই যেমন তাঁহার কাব্য সকল সম্প্রদায়ে সকল সময়ে সকলের প্রিয়, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীয় অনবদ্য রামায়ণকাব্য সেইরূপ সর্ব্বকালানুযায়িনী, সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রামায়ণ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে, বা ভাবও সুস্পষ্ট নহে, সেই সকল কাব্যের প্রভাব সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস,—এই দুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাস ও অন্যান্য রামায়ণ-রচয়িতা— কৃত্তিবাসের পরে আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনা-পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা কঠিন।

এ পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে কৃত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় রাম-চরিত নিবদ্ধ করেন। তাহার

পরে আরও চতুর্দ্দশ ব্যক্তি[২৭] রামায়ণী কথায় পুস্তক রচনা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। কালে হয়ত আরও অনেক নাম পাওয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার ইতিহাস-লেখক অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেন মহাশয়ও সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এতদুভয়ের সমবেত চেষ্টার ফলেই আমরা আজ কৃত্তিবাসকে প্রকৃত ভাবে চিনিবার অবসর পাইয়াছি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে প্রকার পাঠ-বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহাতে প্রকৃত কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও দুর্লভ। তবুও যতটা পাওয়া যাইতেছে, তজ্জন্য সাহিত্যপরিষদ্ এবং দীনেশবাবু বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কৃত্তিবাস এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকে একই রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়, সকল সমাজের আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি ?

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণমাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোষ্ঠীবন্ধনে—সর্ব্বত্রই নানা ভাবে ও নানা আকারে রামবিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে—কৃত্তিবাসের বহু পূর্ব্ব হইতে—চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ লোকমুখে স্ত্রী-পুরুষ-সমাজে* রাম-সীতার কথা কীর্ত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃত্তিবাস তদীয়

গ্রন্থরচনায় এই লোকপরম্পরাগত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে বা মহর্ষি-চিত্রিত আলেখ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যদি কৃত্তিবাস রত থাকিতেন, তাহা হইলে তদীয় কাব্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী রামায়ণ-লেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃত্তিবাসের ন্যায় মৌলিকতা নাই। অধিকাংশ স্থানই অনুবাদমাত্রে পর্য্যবসিত। কোনও রামায়ণকার স্বকীয় কল্পনার চঞ্চল বৈদ্যুতী প্রভায় গ্রন্থ কচিৎ ভাস্বর করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কল্পনার দৈন্যে গ্রন্থের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। এই স্থলে কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিচন্দ্র তাঁহার রচিত রামায়ণে অঙ্গদ-রায়বার নামে যে অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, যাহা আজ কৃত্তিবাসের বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশ গৃহে আদৃত, সেই অধ্যায়টি বাস্তবিকই অনেকটা কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই অনুপাতে কবিচন্দ্রের গ্রন্থের অপরাংশসমূহ গ্রহণ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত অনেকে যেমন দু'একটি মনোহারিণী কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও করিতেন,—যে কবিতাগুলি "উদ্ভট" আখ্যায় জন-সমাজে প্রচারিত, কিন্তু ঐ উদ্ভট-কর্ত্তাদের কোনও বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ পাওয়া যায় না, চঞ্চল কল্পনার ক্ষণিক অনুগ্রহে মাত্র দু'চারিটি হৃদয়াকর্ষিণী কবিতাতেই তাঁহাদের কবিত্ব পরিসমাপ্ত,—তদ্রূপ অন্যান্য রামায়ণকারগণের অনেকেরই

দু'-একটি, বা কাহারও দু'চারিটি রসভাবপূর্ণ অধ্যায়-রচনার পরই কবিত্বের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে কবিতার উচ্ছলিত তরঙ্গলীলা একমাত্র কৃত্তিবাসেই পরিদৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত, কিরূপ আলেখ্যে তাঁহাদের নয়ন-রঞ্জন হইবে। কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্ব্বদা এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই, কেবল বাল্মীকির আদর্শ তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজন মত অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্য কবির সমসাময়িক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অনুসরণে নির্ম্মিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে পরিপূর্ণ, সে কবির কাব্য ততই অল্পকাল-স্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকগণের রামায়ণগ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহাদের রামায়ণের যে যে

অধ্যায়গুলি এই প্রকার কোন বিশেষ ভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে, সকল সময়ের অনুগত করিয়া লিখিত, সেই সেই অধ্যায়গুলির মর্য্যাদা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দ্রের "অঙ্গদ-রায়বার" ও রঘুনন্দন গোস্বামীর "রামরসায়নের" অশোকবন-বর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সরল ভাষা এবং সুস্পষ্ট ভাব,—এই দুই দুর্লভ সম্পদে কৃত্তিবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায় তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কোথায়ও দুষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। যে কবি যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জল ভাষায় মনের ভাবরাশি তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিতেন বলিয়াই তাঁহার রামায়ণ অপরাপর রামায়ণ অপেক্ষা ভাবুক-সমাজের, অথবা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সমাজেরই এত প্রিয় হইয়াছে।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এইগুলির

অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকালে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তররামচরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য-সহকারে রঙ ফলাইয়া সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন—যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবান্বিত হইয়াছে—কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহর্ষিকৃত আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগপূর্ব্বক, সেই সেই চিত্র বঙ্গীয় সমাজের অনুগত ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন,—অলঙ্কারের গুরু ভারে, বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র একভাবে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য চিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণীসঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সকলের উপভোগ্য হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রক্ষেপ—কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার প্রায় এক শত বৎসর পরে নবদ্বীপে

শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। চৈতন্যের আবির্ভাবের এবং তদীয় প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হস্তলিখিত কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুস্তক এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায়, তবে তখন কৃত্তিবাসের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির সমাধানের উপায় অনেকটা সহজ হইবে। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে যে ভক্তির স্রোত, প্রেমের বান ডাকিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের রামায়ণসমূহে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যে সময়ে যে ভাব দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দেশকে বিভোর করিয়া ফেলে, সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্যাদিতেও সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র সাহিত্যিককে 'তদ্ভাবভাবিত' করিয়া তোলে। তাই পরবর্ত্তী কালের কৃত্তিবাসে আমরা কি বীর, কি করুণ সকল রসেই নদীয়ার ভক্তির তরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। লিপিকারগণ সুবিধা পাইলেই রামের স্থলে শ্যাম করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত কৃত্তিবাসের অনেক অনাবশ্যক স্থলে অতর্কিত বৈষ্ণবী দীনতার পরা কাষ্ঠা দেখিতে পাই। কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত বীরবাহু, পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব লিপিকারগণের কৃপায়, দীনাতিদীন বৈষ্ণবসেবক-গণের ন্যায় করযুগল জুড়িয়া ধরণীতে লুটায়। তুলসী-তলার মৃত্তিকায় অঙ্গরাগ করিয়া বৈষ্ণব যেমন "শ্রীবাসের আঙ্গিনায়" মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরূপ

রাক্ষসগণও কপিগণকে গল-লগ্নবাসে প্রণাম করে। এইরূপ অনেক স্থলেই বৈষ্ণবীয় কোমলতার ও দীনতার চরম দেখিতে পাই। এ সমস্তই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সংক্রামক রোগের পরিচয় আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের দুই-একটি স্থল ঈষৎ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক, কোথাও বা প্রমাণসূত্রটিকে বদ্‌লাইয়া সমগ্র গ্রন্থখানিকে "হিন্দু" করিয়া তোলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসে পাঠবৈষম্যের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। বহুকাল পূর্ব্বের হস্তলিখিত যে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের ত মিল নাই-ই, এমন কি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের দ্বারা প্রথম যে "কৃত্তিবাস" মুদ্রিত হয়, তাহার সহিতও বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে আদৌ মিল নাই। মিশনারিদের পুস্তকে যেখানে আছে,—

"প্রাকুল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি।
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি॥"

সেই স্থানে পরবর্ত্তী কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে আছে,—

"রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি॥"

পরবর্ত্তী কালে ভাষার পরিমার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আদিকবি কৃত্তিবাসও "পরিমার্জ্জিত" হইয়াছেন ! কবির কাব্য পরিষ্কৃত করিতে যাইয়া সংশোধকগণ আবর্জ্জনারাশির দ্বারা কৃত্তিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন ! এই ব্যাপারের মূলে আর একটি সত্য নিহিত আছে। আমাদের দেশে যখন যে কোনও নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছে, আমরা তাহাকে ধীরে ধীরে পুরাতনের সহিত মিশাইয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া "আপন" করিয়া লইয়াছি। আমাদের এই adaptability আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সাহিত্য এখনও টিকিয়া আছে। নানাবিধ নব নব ভঙ্গিরাগবিভূষিত, শ্রুতিমধুর বঙ্গভাষার যেমন আবির্ভাব হইল, অমনই আমরা আমাদের প্রাচীন, দুর্ব্বোধ-শব্দ-সঙ্কুল ভাষাকে তাহার অনুগত করিয়া লইলাম ; তাই আমরা প্রাচীন

"অমিয় সায়রে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল"

ইহার স্থলে

"অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল হলো"

করিয়া ফেলিলাম। প্রতিমার মূল পঞ্জরের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলাম না বটে, কিন্তু একটু নূতন ভঙ্গিতে বর্ণযোজনা করিয়া প্রাচীনাকে নবীনা করিয়া তুলিলাম। ইহাতে প্রাচীনার অঙ্গহানি ঘটিল।

এইরূপে মূল কৃত্তিবাসের অর্দ্ধ-সংস্কৃত, অর্দ্ধ-হিন্দি অনেক শব্দ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে ক্রমে বর্ত্তমান বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাই প্রাচীন কৃত্তিবাসের

"মুঞি" "ভিলন্ত" "কর‍্যা" "থুয়্যা" "পাকল" প্রভৃতি অধুনা অপ্রচলিত শত শত শব্দের পরিত্যাগ সাধিত হইল। ইহা কালের নিরঙ্কুশ বিধান। ইহার উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব তত অধিক নাই। যাহা গ্রাহ্য, কাল তাহা গ্রহণ করিবে; যাহা বর্জ্জনীয়, কাল তাহা বর্জ্জন করিবে।

শাক্ত এবং বৈষ্ণব—এই দুই সম্প্রদায়ের লিপিকারগণের কল্যাণে কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে যেমন শাক্ত প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই বৈষ্ণব প্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি হইতে অনেক মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক নূতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃত্তিবাসের গ্রন্থে পূরিয়া দিয়া স্ব স্ব আত্মাভিমানের পূজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কৃত্তিবাস হইতে শত শত স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—ঐতিহাসিকের সে কার্য্য হইতে আমি বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করি।

কৃত্তিবাসের কল্পনা—তাহার গন্তব্য পথ— রামায়ণী কথার আশ্রয়ে কালিদাস ভবভূতি, রঘুবংশ উত্তরচরিত রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে স্থানে যেরূপ

প্রয়োজন, তাঁহারা নূতন মূর্ত্তিও গঠন করিয়াছেন। কবিরা কল্পনার বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান্। সেই সতত চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে, কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবিকৃত সৃষ্টিতে অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষিকৃত পথ কল্পনার দৌত্যে অল্পবিস্তর ছাড়িয়া অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ নিজ কল্পনার দ্বারা অনেক আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থ মনোজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতির সৃষ্টি তাঁহার চরম কল্পনাশক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাসচঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিচালিত বা ভ্রূকম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই।

কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও-বা নূতন পথে, যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন, বীরবাহু প্রভৃতির সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

কবির পরিচয়—আনুমানিক ১৩০৬ শক—১৩৮৫[২৮] খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের প্রতিগৃহে যে দিন বীণাপাণির চরণকমল অর্চ্চিত হইতেছিল, "সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ" বলিয়া যে দিন ভক্তি-গদ্‌গদকণ্ঠে স্তব করিতে করিতে হিন্দু তাহার চিরপ্রার্থিত দেবতার চরণে মস্তক স্থাপন করিতেছিল, সেই শুভক্ষণেই যাঁহার জন্ম, তাঁহার জীবন যে সেই বাগ্‌দেবতার অনুগ্রহে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে, তাহাতে আর কথা কি?

৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর কনোজ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে এ দেশে আনয়ন করেন, তাঁহাদের অন্যতম ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে সপ্তদশপুরুষ অধস্তন নরসিংহ ওঝা বেদানুজ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই বেদানুজ সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রামের রাজা ছিলেন। আন্দাজ ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে এই নরসিংহ অরাজক স্বর্ণগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিবার সঙ্কল্পে ফুলিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ফুলিয়ার তখন বড় স্পর্দ্ধার দিন। কৃত্তিবাস নিজেই স্বীয় বংশপরিচয়ের উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে এখানে "মালঞ্চ"ঃ ছিল, নানাবিধ ফুলের বাগান ছিল, তাই ইহার নাম

হয়—"ফুলিয়া"। এই ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বীচিমালিনী ভাগীরথী রজতধারায় প্রবাহিত ছিলেন। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যের ইহা লীলানিকেতন ছিল। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ নরসিংহ তাঁহার তদানীন্তন পদোচিত বিভবাদির সহিত এই মনোহর স্থানে আসিয়া একেবারে জুড়িয়া বসিলেন। কৃত্তিবাসের ভাষায়

"ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য়ে সন্ততি॥"

ফুলিয়া "চাপিয়া" তাঁহার বসতি হইল। এই নরসিংহের পরম দয়ালু পুত্র গর্ভেশ্বর কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ। গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি ওঝা, কৃত্তিবাসের পিতামহ, এক জন প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার কোন গ্রন্থাদির পরিচয় পাই না সত্য, কিন্তু কবি কৃত্তিবাস স্বয়ং তাঁহাকে ব্যাস-মার্কণ্ডেয়াদির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের নিজের উক্তিতেই দেখিতে পাই, বাল্যে তিনি প্রথমতঃ চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই চতুষ্পাঠীর শিক্ষাই তদীয় সংস্কৃত রামায়ণ-পাঠের সোপান। পাঠ-সমাপ্তির পর, সেই কালের প্রথা-অনুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় আত্ম-পরিচয়ার্থ[১১] উপস্থিত হন। রাজা তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। "তথাস্তু" বলিয়া

কৃত্তিবাস যখন সগর্ব্বে বাহির হইলেন, তখন সকলে "ধন্য ধন্য" বলিয়া কবির অভ্যর্থনা করিলেন:

"সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে তথা কৃত্তিবাস গুণী ॥"

বলিয়া সহস্র মুখে কৃত্তিবাসের প্রশস্তি-সঙ্গীত উচ্চারিত হইল। কৃত্তিবাস স্বয়ং এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন, আত্মবংশের বিশিষ্ট পরিচয়-প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে কত বড় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমি আর বিশেষ কি বলিব! এখনও "ফুলিয়ার মুখটি"[৩০] বলিয়া আমরা তাঁহারই বংশের স্পর্দ্ধা করি। রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রধান এবং মুখ্য বংশ "ফুলিয়ার মুখটি"—কৃত্তিবাসেরই অনুস্মৃতি মাত্র।

মাহেন্দ্রক্ষণে রাজা কৃত্তিবাসকে রামায়ণ-রচনার আদেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার অরুণ-রাগরঞ্জিতা উষার প্রথম আলোকচ্ছটা কৃত্তিবাসের মস্তকে প্রথম স্বর্ণ-কিরীট পরাইয়া দিয়াছিল,—বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষা ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে। পল্লী-প্রান্তরের স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায়, জনপদ-বধূর গোষ্ঠীবন্ধনে, বর্ষীয়সী ললনাদিগের বিশ্রামকক্ষে কৃত্তিবাসের বিরচিত গাথা গীত ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইতেছে। ভাষায় যাহার

সম্যক্ অধিকার নাই, সেই অৰ্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিও প্রেম-ভরে রামায়ণ গান করিয়া আত্মহারা হইতেছে, আর সেই সঙ্গে, নিরক্ষর সরল কৃষক সাশ্রুনয়নে ও তন্ময়-হৃদয়ে সে গান শুনিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছে। এখনও একাদশীর অপরাহ্ণে মলিনবসনা বিধবারা সমবেত হইয়া কোন ললিতকণ্ঠ বালকের দ্বারা রামায়ণ পড়াইয়া শুনিতেছেন, তাঁহাদের উপবাস-ক্লিষ্ট হৃদয়ে ভক্তির রস উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। মনোহর কল্পনা, মধুর ভাব, অনুপম সৃষ্টিকৌশলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠসম্পদ্‌রূপে পরিগণিত। কৃত্তিবাসের পর আজ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি বঙ্গবাণীর পাদপূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পূজার উপকরণ—ফুল, ফল, পল্লব—কৃত্তিবাসের ঐ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে চয়িত ও সংগৃহীত। কৃত্তিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে, বিপণির পণ্যকুটীরে, চাষার আশার কৃষিক্ষেত্রে—সর্ব্বত্র কীৰ্ত্তিত হইতেছে। আজ আর

"দক্ষিণে পশ্চিমে যার গঙ্গা তরঙ্গিণী"—৩১

সে "ফুলিয়া" নাই, সে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের সেই "চাপিয়া বসতি"র চিহ্নও নাই; কিন্তু সেই ফুলিয়া-

পণ্ডিতের মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া—বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

কৃত্তিবাসের এই সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতকগুলি কারণও দেখা যায়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্ব্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, ঔশীনরী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারতবাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে—প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে, নিশীথে নিস্তব্ধ রজনীর সৌম্যমূর্ত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত, বা অনুভূতির বিমল কর ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সান্ধ্য সুষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই,—প্রাণ অকৃপণ ভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। কৃত্তিবাস অকৃপণ ভাবে আপনার প্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না; সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কবিতার কোথায়ও কোনরূপ

বাধা দেখিতে পাই না,—সর্ব্বত্রই সমান এবং অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয় যেন এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, মহাকবি তাঁহার সাধের রামায়ণ-গান গাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শ্রোতৃবর্গও মজিয়াছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে, যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবেন তত দিন করিবেও।

তুমি যখন অভ্রভেদী, শুভ্রতুষারশীর্ষ হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায় তখন যদি তোমার হৃদয়ে কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট্ শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট্ হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয়ত তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পারিবে। অন্যথা তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গম্ভীর-মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে? তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত নিজেকে মিশাইতে না পার, "তদ্ভাব-ভাবিত" করিতে না পার, তবে কদাচ তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসিগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দীপক রাগের সময়ে তুমি বেহাগ পূরবীতে আলাপ করিলে, তাহা কখনও জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির সুখ হয় না, বরং

পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে, এ তত্ত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এ দেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন্ উপকরণ তাহাতে অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশবাসিগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি তদীয় কল্পনার মোহন বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার, বসন্তের পিকঝঙ্কারের ন্যায়, বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ—একেবারে আকুল—করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান, কতটুকু চান, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে,"—এ জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কলাবিদ্যা-বিশারদই হও না কেন, তোমার লেখায় বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে তোমার সামাজিকবর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে তোমার দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়, থাকিয়া যায়; আর যাঁহাদের এই জ্ঞান নাই, তাঁহাদের

*লেখা ছিন্ন তুষারের ন্যায়*** অতি অল্পকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্য রামায়ণ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর-ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান। কৃত্তিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও ভালবাসিতেন। তাই তিনি যদি কখনও সামান্য একটু গুন্ গুন্ করিয়া স্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনই সেই গুন্ গুন্ ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই যেন তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক অকস্মাৎ তাঁহার কর্ম্মময় দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ প্রেমিক কবি কৃত্তিবাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত, আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে। কবে

কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে "মা নিষাদ" বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইতেছে ও ভারতবাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে; সেইরূপ কবে কোন্ দিন, কোন্ শুভমুহূর্ত্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুলকুল গীতির সুরে সুর মিলাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন—আজ সে ফুলিয়া নাই, সে ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেই স্বপ্নময়, আবেশময় তানের এখনও যেন শেষ লয় হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা—কিছুই নাই, তবুও সেই রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও, তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই, সে জাহ্নবী নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবে না। রাম-সীতার পাদস্পর্শে অযোধ্যা যেমন চিরকালের মত তীর্থ হইয়া রহিয়াছে, কৃত্তিবাসের পাদস্পর্শে তেমনই ফুলিয়া বঙ্গের সাহিত্য-সাম্রাজ্যের প্রধান তীর্থ হইয়াছে। ফুলিয়ার মুখটি, শুধু ফুলিয়ার নহে, বাঙ্গালার গৌরবের স্থল, পরম স্পর্দ্ধার ভাজন হইয়াছেন। জন্মজন্মান্তরে কৃত্তিবাস কত তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে তপস্যার ফলে তিনি ত

অমর হইয়াছেনই, তাঁহার মাতৃভাষাকেও অমর করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের স্বর্ণমন্দিরের তিনিই ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যে দেশে এবং যে জাতিতে কৃত্তিবাসের ন্যায় কবি আর্বির্ভূত হন, সে দেশ ধন্য, সে জাতি বরেণ্য। কৃত্তিবাস বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া দিয়াছেন; তিনি যে সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, আজ এই পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যিনি যতটুকু পারেন, সেই সঙ্গীতেরই "তান" প্রদান করিতেছেন। তাঁহার সাধনার ফলে তাঁহার স্বজাতির জাতীয় সাহিত্য ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বাঙ্গালীর যতই চক্ষু ফুটিতেছে, ততই তাহারা তাঁহার আদর করিতে শিখিতেছে।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং বন্ধুবর সতীশচন্দ্র,** আপনারা মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে অদ্য এই যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন—পূজ্য মহাপুরুষের পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন—এ জন্য আপনারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কৃত্তিবাস যে সমুন্নত বংশের অলঙ্কার ছিলেন, সেই ফুলিয়ার মুখটির একজন কবিতা-রসবঞ্চিত অভাজনকে আপনাদের অদ্যকার উৎসবে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে কুলে আমার জন্ম, সেই কুলের একজন প্রধান পুরুষের এবং বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মহাকবির স্মৃতিবাসরে আমি উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া নিজেকেও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি।

এস কৃত্তিবাস, তোমার বড় সাধের ফুলিয়ায় একবার ফিরিয়া এস! এই দেখ তোমার উদ্দেশে, কত শত ভক্ত আজ সজলনেত্রে ফুলিয়ায় উপস্থিত। তুমি তাহাদিগের সারস্বত ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্ন দিয়া গিয়াছ, সেই রত্নের গৌরবে তাহারা আজ গৌরবান্বিত—কৃত্তিবাসের স্বজাতি বলিয়া আদৃত। এস কবি, আবার আসিয়া

"পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কাণে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী,
তেমতি, যশস্বী, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।" ••

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।" ৩৫

বন্ধুবর যোগীন্দ্রনাথ কবিভূষণ ও সমবেত সভ্যবৃন্দ, যে মহাকবির স্মৃতিবাসরে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি, তিনি, শুধু বঙ্গের নহেন, সমগ্র ভারতবর্ষের বরণীয় ও প্রেমিক কবিশ্রেষ্ঠগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাকবির আবির্ভাবে বঙ্গদেশ চিরদিনের মত পূজনীয় হইয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার কবিতারূপিণী মন্দার-মালায় বঙ্গভাষা আচন্দ্রদিবাকর সুশোভিত হইয়া থাকিবে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি মহাকবিগণের বহুযত্ন-কল্পিত কবিতা-কাননে মধুময় মধুসূদনের মধুমতী ভাব-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশকে যেন চিরদিনের মত সরস করিয়া রাখিয়াছে।

বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলের এমনই একটা মাহাত্ম্য, বাঙ্গালার শ্যামল শস্যক্ষেত্রের, সুনীল বনাবলীর এমনই একটা মাধুরী, এমনই একটা উন্মাদকতা যে, অতিবড় নীরস পাষাণেও এখানে নির্ঝর দেখিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমরা সত্যই

"পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে।" ••

তীর্থস্থানে উপনীত হইলে যেমন হৃদয়ে কেমন একটা স্পৃহণীয় ভাবের উদয় হয়, অরুণোদয়ে নীলাম্বুরাশির বেলাভূমিতে উপবিষ্টের মনে যেমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশ হয়, সায়ংকালে পল্লীপ্রান্তরে সমাসীন ব্যক্তির পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দোয়েল-শ্যামার তানে নয়ন ও মনে যেমন একটা আনন্দময়ী জড়তার আবির্ভাব হয়, এই বাঙ্গালার পল্লীকুঞ্জে যাঁহারা গান করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে স্বতঃই ঐরূপ ভাবাবেশ জন্মিয়া থাকে। যাঁহারা আবার ভাগ্যবান্, বিধাতার অনুগ্রহ যাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত, তাঁহারা ঐ ভাবাবেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্য হন, মরজীবন সার্থক করেন। দিবাবসানে, যখন পল্লীপদ-বাহিনী তটিনী কুলকুল গীতিকায় পথিকের প্রাণে কেমন একটা উদাস ভাব জাগাইয়া বহিয়া যায়, তটবর্ত্তী বটবৃক্ষের মূলে সমাসীন পথিকের হৃদয় সান্ধ্য সমীরণে যেন কেমন বিভোর হইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তখন সেই আত্মবিস্মৃত ব্যক্তির

অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের সুপ্ত বীণা আপনিই অনুরণিত হইয়া উঠে। যদি তাহার চিত্তে প্রেম থাকে, যদি তাহার জন্মান্তরের পুণ্য থাকে, তবে তখন সে পাগলের মত গাহিতে থাকে,—তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী কল্পনাময়ী প্রতিমার চিরপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া মুদ্রিত নেত্রে বলে,—

"মধুর মূরতি তব ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে ও মুখশশী জাগে অনিবার !
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর !"

তখন সে যুক্তকরে তাহার আদরিণী প্রতিমাকে স্তব করিতে আরম্ভ করে, কখনও ধ্যান করে, কখনও আবার দুই হাত বাড়াইয়া সেই সস্মিতবদনা জ্যোতির্ম্ময়ীকে ধরিতে যায়; সত্যই সেই করুণাময়ীর সকরুণ নয়নের দীপ্তিতে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া তখন ঐ ব্যক্তি কত কি বলিতে থাকে,—কখনও শোকাশ্রুতে ধরণী ভাসাইয়া দেয়, আবার প্রেমাশ্রুতে কখন-বা মরুভূমিকে অমরধামে পরিণত করে। তখন তাহার

"সে শোক-সঙ্গীত-কথা
শুনে কাঁদে তরুলতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।

নিরখি নন্দিনীচ্ছবি,
গদ্‌গদ আদিকবি,
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া যায়।" ৩৮

যথার্থই তখন সেই বিশ্বনন্দিনী প্রতিমার প্রতিনিঃশ্বাসে জগৎ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ঐ সাধক-কবি তখন বুঝিতে পারেন না, বা জানিতেও পান না যে, তিনি কি করিতেছেন, কি গাহিতেছেন। (তাঁহার অপ্রবুদ্ধ কণ্ঠের "মা নিষাদ" গীতিকা যে, জগতে এক নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিবে, নূতন রাগের প্রবাহ বহাইবে, ইহার বিন্দুবিসর্গও তিনি তখন ঘুণাক্ষরে জানিতে পান না।) কবি তখন পার্শ্ববর্ত্তিনী বিলাস-বিহ্বলা কমলার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পুরোবর্ত্তিনী করুণাময়ী বাগ্‌দেবতার দিকে অনিমেষে চাহিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ে বলেন,

"এস মা করুণা-রাণী!
ও বিধু-বদনখানি,
হেরি হেরি আঁখি ভরি, হেরি গো আবার;
শুনে সে উদার কথা
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার!
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর!" ৩৯

কবির তখনকার সেই উন্মাদনা-সঙ্গীত যে, কালে এক নব মন্দাকিনী প্রবাহিত করিবে, তাহা কবি বুঝিতে পারেন না।

এমনই অপ্রবুদ্ধ ভাবে, বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরের কবি মধুসূদন একদিন সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন। আদি-কবি বাল্মীকি যখন আপনার গানে আপনিই বিমুগ্ধ ও কদাচিৎ "কি গাহিলাম" বলিয়া সংশয়িত, তখন চতুর্ম্মুখ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রত্নাকরকে আশ্বস্ত করিয়া দিলেন; বলিলেন,—"ঋষিবর, তুমিই জগতের আদিকবি হইলে, অসঙ্কোচে ও উদাত্তকণ্ঠে রামায়ণ গান কর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত হইবে, তোমার গানে মর জীব অমরতার সুখ উপলব্ধি করিবে।" হায়! এ বাঙ্গালার রত্নাকর মধুসূদনের ভাগ্যে ঠিক ইহার বিপরীত ফলিয়াছিল। অথবা শুধু এ দেশে কেন, সকল দেশের মহাকবিদের ভাগ্যেই লাঞ্ছনা সমান! দুর্জ্জন সমালোচকের মর্ম্মঘাতিনী কশায় মহাকবি কীট্‌সের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল![৪০] হায়! অকালে ক্ষয়রোগে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল!

বঙ্গের কবিতাসুন্দরীর রাতুল চরণ শৃঙ্খলিত দেখিয়া মধুসূদনের প্রাণে বাজিয়াছিল, উপাস্য দেবতার দুর্দ্দশায় ভক্তের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, তাই কাঁদিতে কাঁদিতে মধুসূদন বলিয়াছিলেন,—

"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে,
মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি। কত ব্যথা লাগে,
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে।
... ...
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে!"[৪১]

প্রেমে হউক, শোকে হউক, আদরে হউক, উপেক্ষায় হউক, মানুষ যখন পাগল-পারা হয়, তখন তাহার সকল বিষয়েই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়, সে তখন উদ্দাম ভাবে বিচরণ করিতে চায়,—তাহার সমক্ষে তখন বিশ্বের তাবৎ পদার্থই ঐহিক রীতিনীতির শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া, পুরাতন সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া এক অতি মনোরম নবীনতায় সাজিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী,"

এই কবি-বাক্যের তখন প্রকৃত সার্থকতা জন্মে। মহাকবি মধুসূদন বীণাপাণির প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন,—আপনার ইহকাল, পরকাল, সুখদুঃখ, সম্পদ্‌বিপদ্‌, পুত্রকলত্র সমস্ত ভুলিয়া কবিতার সেবা করিয়াছিলেন, যথার্থই "ক্ষিপ্ত গ্রহের" ন্যায় দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া, কবিতাসুন্দরীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়াছিলেন,—

একাগ্র হৃদয়ে ধ্যানে বসিয়াছিলেন,—তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার "অনন্য-পরতন্ত্রা" ভারতীকে মানস সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন,

"দুর্ম্মতি সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়! সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্ম-বাসিনি ভারতি!
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মাগো, এ মোর মিনতি।"[৪২]

তাঁহার 'মিনতি' সফল হইয়াছে। শুধু 'হিয়া' নহে, ভারতীর করস্পর্শে তাঁহার দেহ-মন সমস্তই "পরিমলময়" হইয়াছিল, তাই তাঁহার সংস্পর্শে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গভূমি চিরদিনের মত পরিমলময়ী হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গভাষার রাঙ্গা চরণে "মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি" দেখিয়া মধুসূদনের হৃদয়ে যে কি ব্যথা লাগিয়াছিল, তাহা উপরিধৃত কয় পঙ্‌ক্তি হইতেই বেশ বুঝা যায়। আমি যাঁহার সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিব, যাঁহাকে মা বলিয়া প্রাণ শীতল করিব, কানন-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া যাঁহাকে ডাকিব—আমার সেই ডাকে সমগ্র গৌড়ভূমি চমকিয়া উঠিবে, আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিবে—আমার এমন যে মা, এত সাধের, এত আদরের যে মা, তাঁহার চরণে শৃঙ্খল! পুত্র আমি,

আমার সমগ্র সামর্থ্য ব্যয় করিয়া সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিব। মা আমার উন্মুক্ত চরণে, বনকুরঙ্গীর মত স্বৈর চরণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবেন, আর পুত্র আমি 'মা মা' বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইব। যদি মায়ের চরণ নিগড়-মুক্ত করিতে না পারিলাম, তবে কিসের পুত্র আমি?—কুপুত্র আমি। তাই বাণীর বরপুত্র মধুসূদন সজল-নয়নে বলিলেন,

"ছিল নাকি ভাব-ধন, কহ লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে,
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে!
কি কাজ রঞ্জনে রাঙ্গি কমলের দলে?
নিজরূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে।"••

লৌকিক ভাষায় অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রবর্ত্তনের ন্যায় বঙ্গ-ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া মধুসূদন বাঙ্গালা কবিতার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাঁহার অমিত্রাক্ষরের মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইবে। অনেকের কবিতা পাঠকালেই হৃদয়ের ওজস্বিতা যেন কর্পূরের মত ক্রমে উপিয়া যায়, ক্রমে শরীর ঝিমাইতে থাকে, দেহে অহিফেনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর মধুসূদনের ওজস্বিনী কবিতা পাঠ করিয়া—

"উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।"••

মধুসূদন চাহিতেন যে, তাঁহার স্বজাতিকে, তাঁহার চিরপ্রিয় গৌড়জনকে এমন সুধা পান করাইবেন, যাহাতে তাহারা মানুষের মত হইবে। একেই ত নানা ভাবে সকলে ক্রমে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, ইহার উপর আবার ঘুমের ঔষধপ্রয়োগ কেন? এখন জাগ্রত করিতে হইবে। তাই মধুর সমস্ত কবিতাতেই একটা প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, তাঁহার কবিতার সমস্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত, তাহাতে বিদেশীয় মসলা নাই। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য জগতের ভালমন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পিতামহের প্রাচ্যের প্রতিমার স্থানে কদাচ পাশ্চাত্ত্য প্রতিমা বসান নাই, জাতীয়তা বিসর্জ্জন দেন নাই। পশ্চিম গগনের সুচারু সান্ধ্য রাগের আভায় তিনি তদীয় কবিতারাণীর ললাট মার্জ্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণ-রাগে। তাই তাঁহার কবিতার বিনাশ অসম্ভব। উপবৃক্ষই কালে শুকাইয়া যায়—মূল বৃক্ষের কিছুই হয় না। সোজা কথায়, ইউরোপের নানা কারুকার্য্যখচিত সুন্দর ফ্রেমে তিনি ভারতীয় ছবি বাঁধাইয়াছেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা দেশান্তর হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু জাতীয় কবিতাও যদি বিজাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিতে হয়, তবে

আর রহিল কি? এরূপ দুষ্কার্য্যের ফল জাতীয়তার ক্রমিক ধ্বংস।

মহাকবি মধুসূদন সে পথে যান নাই। তিনি ইউরোপের অমিত্রাক্ষরে এ দেশের কবিতাকে সাজাইয়াছেন। তিনি গৌড়কে প্রাণময় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্গের কবিতাকে মদালসার পরিবর্ত্তে বীরাঙ্গনার ভূষায় ভূষিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন,—কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। নাটকপ্রহসনাদি সম্বন্ধে তাঁহার সাফল্য তর্কের বিষয় হইলেও অমিত্রচ্ছন্দের সম্পর্কে তিনি যে নব যুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। মধুসূদনের পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ অন্যভাবে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু তাহার কোনরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল না। মধুসূদনের যে কম্বুনাদে বঙ্গসাহিত্য-গগন মুখরিত, তাহার এক ভগ্নাংশও ঐ সব প্রাণহীন কবিতায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। শুধু তাঁহার নয়নের নহে, তাঁহার কবিতার "হিরণ্ময় জ্যোতিতে"ও " বাঙ্গালা ভাষা চিরদিনের মত জ্যোতিষ্মতী হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কার্য্যে এবং কবিতায়, উভয়ত্রই একটা উৎকট আবেগ দেখিতে পাই। কার্য্যক্ষেত্রে যেমন তিনি কদাচ জড়তার অধীন হইতেন না, কখনও এক ভাবে একটা বিষয় লইয়া থাকিতে পারিতেন না,—সর্ব্বদাই চাহিতেন, যাহা করিতেছেন তাহা ছাড়া আরও একটা কিছু,—কবিতার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। যখন যেখানে গিয়াছেন, ভালমন্দ

যেমন অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের টান কিন্তু কবিতার প্রতি সর্ব্বদাই সমান। কোন কারণে, কোন অবস্থাতেই তাহার ন্যূনতা ঘটে নাই। বরঞ্চ বাহ্য বিশৃঙ্খলা, সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কবিতার সেবায় তিনি অধিকতররূপে নিবিষ্ট হইতে পারিতেন। আত্ম-সত্তায় তাঁহার প্রভূত বিশ্বাস ছিল, তাই যখন একটা নূতন কিছু করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন দৃঢ়তার সহিত বন্ধু-বান্ধবকে তাহার সাফল্যের কথা বলিতেন। মাইকেল সর্ব্বপ্রথম যখন চতুর্দ্দশপদী কবিতা লেখেন, তখন তিনি প্রথম কবিতাটি তদীয় প্রিয় ও অকৃত্রিম সুহৃদ্ রাজনারায়ণ বসুকে পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন :

"What say you to this, my good friend? In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian."

তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী তিনিই সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সনেটটি কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ মাইকেল-জীবনীতে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই :

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,

অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন-শয়ন ত্যজে ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায়-মন।
বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা, "হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি? কহ ধনপতি!
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?"

এই কবিতা-রচনার অনেক পরে মাইকেল চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী নাম দিয়া যে কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করেন, এইটি তাহার দ্বিতীয় কবিতা; মনে হয়, উদ্ধৃত কবিতাটি মাজিয়া-ঘষিয়া কবিবর "বঙ্গভাষা" নামে বাহির করেন; কেন-না প্রথমের কথা ভোলা বা প্রথমের মায়া ছাড়া বড়ই কঠিন।

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,

পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি,—
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!'

পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

তিলোত্তমা-রচনার পর চতুর্দ্দশপদী কবিতায় মাইকেল হাত দেন।[৩৬] তিলোত্তমা অমিত্রচ্ছন্দের একপ্রকার প্রথম কাব্য। বোধ হয় বঙ্গের তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী তিলোত্তমার প্রতি প্রথম প্রথম তত সদয় ব্যবহার করেন নাই। মাইকেল যদিও কখনও আত্মমতানুযায়ী কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই, বা পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কবিতা লেখেন নাই, তবুও কিন্তু বঙ্গের নূতন ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা তাঁহার আদরিণী তিলোত্তমাকে

অন্যে আদর করিতেছে দেখিয়া, আনন্দে বন্ধু রাজ-নারায়ণকে লিখিয়াছিলেন :

"You will be pleased to hear that the Pandits are coming round regarding Tilottama. The renowned Vidyasagore has at last condescended to see 'great merit' in it, and the 'Shome Prakash' has spoken out in a favourable manner."

বঙ্গভাষার প্রধান মহাকাব্য মেঘনাদবধ প্রকাশ-বিষয়ে রাজা দিগম্বর মিত্র অর্থ-সাহায্য করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া, বঙ্গ-কবিকুল-কেশরী মধুসূদন নিজেকে অশেষ সৌভাগ্যশালী মনে করিয়াছিলেন। হায়! বাণীর বরপুত্রের এই সময়ের উক্তিতে নয়ন সজল হইয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন,—"In this respect, I must thankfully acknowledge I am singularly fortunate. All my idle things find patrons and customers * *" তাঁহার 'idle things'গুলি আজ বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন, বঙ্গবাণীর কিরীটমণি এবং বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর অশেষ গর্ব্বের কারণ।

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যাবলীর প্রত্যেক-খানিই যেমন নিজের নিজের এক অতি অসাধারণ ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পন্ন, মধুসূদনের কবিতা-গ্রন্থগুলিরও প্রত্যেক-খানি সেইরূপ এক একটি অসাধারণ ধর্ম্মে বিমণ্ডিত

ও শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পন্ন। সেইরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম বাঙ্গালার অন্য কোনও কাব্যে আছে কি-না, বা কালে থাকিবে কি-না, তাহা বলিতে পারি না। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা যখন পড়ি, দ্বারকানাথের উদ্দেশে রুক্মিণীর সেই পত্র—সেই,

"সরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা। চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কান্দি দিবানিশি,—
নীরবে দু'জনে কাঁদি সভয়ে বিরলে!
লইনু শরণ আজি ও-রাজীব-পদে ;—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্ন মোরে।
কি ছলে ভুলাই মনঃ, কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি!
বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে ;
'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি, কূলে তার কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব—তুমি হাসিবে শুনিলে।
পুষিয়াছি সারী-শুক, ময়ুর-ময়ুরী
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত ;
কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাজী।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে।
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,

আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া ;
কিংবা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে ।” ৩৭

এই অনুপম পঙ্‌ক্তিগুলি যখন পাঠ করি, তখন যথার্থই আত্মবিস্মৃত হই, কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি-চাতুর্য্য-দর্শনে ও শব্দ-গ্রন্থনের অনুপম কৌশলে একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়ি। তখন

“ তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়াপি বা।
পাদবিন্যাসমাত্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া ॥ ” ৩৮

অলঙ্কারিকের এই উক্তির প্রকৃত অর্থবোধ হয়। এমন সুন্দর কবিতা, সুন্দর পদ-রচনা, সুন্দর ভাবাবেশ যে ভাষায় আছে, যে ভাষায় হইতে পারে, সেই ভাষা আমার মাতৃভাষা, সেই ভাষা আমার জন্মভূমির ভাষা, আমার বাঙ্গালার ভাষা—ইহা যখন ভাবি, তখন সত্যই একটা অপূর্ব্ব শ্লাঘা অনুভব করি। যখন

“ এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন !
দোলাইব শ্যাম-গলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তারে করিব বন্ধন !
হ্লাদে, তোর পায়ে ধরি, কহ না, লো, সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধা-বিনোদন ?

কি কহিলি, কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে, কেন কাঁদ, ধনি!
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?" ৪৯

প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনার বিষাদ-গীতিকা শ্রবণ করি, তখন এই সকল কবিতার প্রতি চরণে, প্রতি অক্ষরে, মধুধ্বনি মধুসূদনের নবনীতকল্প হৃদয়ের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাই।

আবার—

"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কা'র হেন সাধ্য বল রোধে তার গতি?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি! ভিখারী রাঘবে?" ৫০

প্রমীলার এই মেঘমন্দ্রধ্বনির সহিত ব্রজাঙ্গনার ঐ মধুধ্বনি মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যায় যে, বিধাতা কি অপূর্ব্ব উৎকটে-মধুরে, কঠোরে-কোমলে, রৌদ্রে-জ্যোৎস্নায় মধুর কল্পনা-প্রতিমার গঠন করিয়াছিলেন!

কল্পনা সহচরীর ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত। কোনও কল্পনার মন্দতায় বা ভাবের অল্পতায় তাঁহার কবিতার অঙ্গহানি ঘটে নাই। তাঁহার যে কোনও কবিতা যখনই পাঠ করি, দেখি তাহাতে তদীয় হৃদয়ের দৃঢ়তার একটা ছায়া যেন স্বতঃই লাগিয়া আছে। বঙ্গ-কাব্য-কাননে তিনি দৃপ্ত সিংহের ন্যায়, মদগর্ব্বিত নাগেন্দ্রের ন্যায় বিচরণ করিয়া গিয়াছেন,—কোথাও কদাচ কোন কারণে তিনি স্খলিত হন নাই। বিশ্বের কে কি বলিল, কে কি করিল,—যে পথে চলিয়াছি ইহাতে কোথায় কতদূরে যাইয়া পান্থশালা পাইব,—যে পাথেয় আছে তাহাতে কুলাইবে কি-না, এই সব ঐহিক হিসাব-নিকাশের তিনি কোন ধারই ধারিতেন না। তাঁহার পৃথিবী এক স্বতন্ত্র বস্তু ছিল। তাঁহার পৃথিবী যথার্থই "নিয়তিকৃত-নিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী, অনন্য-পরতন্ত্রা এবং নবরসরুচিরা" [৫১] ছিল। মহাকবি তাঁহার সেই কল্পিত জগতের কল্পনা-সাগরে নিজেকে ভাসাইয়া দিতেন, ক্ষীরোদশায়ী পুরুষোত্তমের ন্যায় নিজের ভূমায় নিজেই ডুবিয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে আনন্দালস নেত্রে স্বদেশ-বাসীদের দিকে চাহিয়া প্রেমভরে মধুবর্ষণ করিতেন, "যোড় করি কর, গৌড়-সুভাজনে" [৫২] কহিতেন; "শুন যত গৌড়-চূড়ামণি"—বলিয়া যে অমৃতে নিজে আত্মহারা, তাহা বিলাইবার জন্য স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিতেন।

"বিনা স্বদেশের ভাষা পূরে কি আশা ?"

এই কবিবাক্য তাঁহাকে উদ্বোধিত করিয়াই যেন গন্তব্য পথ চিনাইয়া দিয়াছিল। যখন তিনি আদি-কবি বাল্মীকির ন্যায় দিব্যচক্ষু পাইলেন, তখন ধ্যান-ভঙ্গের পর দেখিলেন, তাঁহার বড় সাধের " মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।" তদবধি কি এক উন্মাদনা তাঁহার হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসিল ; সেই উন্মাদনার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কবিবর দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বকীয় স্বৈরচারিণী কল্পনাকে লইয়া ছুটিলেন।—অন্য কথা নাই, অন্য চিন্তা নাই, অন্য কার্য্য নাই,—ঐ এক ধ্যান, এক জ্ঞান। কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলিত মাইকেল-জীবনীতে কবিবরের যে সকল পত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মহাকবি মধুসূদনের চিত্তে দিবা-রজনী বঙ্গভাষার এবং বঙ্গকবিতার চিন্তা কিরূপ প্রকটভাব ধারণ করিয়াছিল। ঐ সকল পত্রের প্রত্যেক-খানির গড়ে প্রতি ত্রিশ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সাতাইশ পঙ্‌ক্তি কেবল বঙ্গকবিতার কথায় পূর্ণ। বিধাতা দেবদুর্লভ প্রেম-রত্নে তাঁহার হৃদয় বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সমস্তই কবিত্বময় ছিল। তিনি দেখিতেন কবিতা, শুনিতেন কবিতা, কহিতেন কবিতা। কখনও তিনি ভারত-সাগরে ডুবিয়া তিলোত্তমারূপ মুকুতা তুলিতেন ও তাহার মালা গাঁথিয়া মাতৃভাষার কমকণ্ঠে পরাইয়া দিতেন,—কখনও আবার

"গম্ভীরে বাজায়ে বীণা গাইল—কেমনে
নাশিলা সুমিত্রাসুত লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;"

কখন বা—

"কল্পনা-দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে,"

"গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি" শুনিতেন, ও সেই "বিরহে বিহ্বলা বালার" করুণ কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের বীণায় বিরহ-সঙ্গীতের আলাপ করিতেন। কত সাগর মহাসাগর পার হইয়া দেশ-বিদেশে তিনি ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের প্রতি তাঁহার কেমনই একটা আকর্ষণ ছিল যে, তিনি উদ্দাম যৌবনেও ডুব দিলেন "ভারত-সাগরে"—অন্য সাগরে নহে; পাশ্চাত্ত্য কবিকুলের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও তিনি তিলার্দ্ধের জন্য প্রাচ্য কবিকুলের সেবা করিতে বিস্মৃত হন নাই। "কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদ" পাথেয় লইয়া তিনি দুর্গম কবিত্ব-কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ••

তাঁহার কবি-জীবনের দুইটি স্তর আমরা দেখিতে পাই। প্রথমটি কবির ইউরোপ-গমনের পূর্ব্ব কাল, দ্বিতীয়টি ইউরোপ-যাত্রা হইতে তাহার পরবর্ত্তী কাল। তাঁহার যে সমুদয় কাব্য-রত্নাবলীতে বঙ্গবাণী অলঙ্কৃত, সেগুলি ঐ পূর্ব্ব কালে গ্রথিত, আর হেক্টর-বধ, মায়াকানন এবং

কবিতামালা ” তাঁহার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর লিখিত। ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, যে শক্তি থাকায় তিনি পূর্ব্বে “ভারত-সাগরে” ডুবিয়া রত্ন তুলিতে পারিয়াছিলেন, ভারত-সাগরের পারে যাইয়া তাঁহার সে শক্তির তিনি উপচয় করিতে পারেন নাই—প্রত্যুত অপচয়ই ঘটিয়াছিল। যদিও চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রকাশ ফরাসীর ভারসেলস্ নগরে, কিন্তু তাহার জন্মগ্রহণ এই ভারতবর্ষে। রাজনারায়ণবাবুর নিকট কবি নিজেই সে কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি যখন ইউরোপে গমন করেন, তখন তাঁহার ঐ প্রথম সনেট্‌টি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, নতুবা রাজনারায়ণবাবুর নিকট লিখিত সেই সনেট্ আমরা বর্ত্তমান চতুর্দ্দশপদী কবিতাপুস্তকে ঐরূপ সংশোধিত আকারে দেখিতে পাইতাম না। তিনি ইউরোপে যাইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে উদ্দেশ্যে তিনি গিয়াছিলেন, তাহার সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি আইন-কানুন যাহাই পড়ুন বা যাহাই করুন না-কেন, প্রাণ কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদাই মাতৃভাষার জন্য কাঁদিত। তিনি নিজেই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছেন,—

“পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি,—

অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,—" ৫৫

বাহ্যতঃ মধুসূদন ইউরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়াছিল। কবে বাঙ্গালায় শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে সারদার অর্চ্চনা, কবে বিজয়া-দশমী, কপোতাক্ষ নদ কেমন কুল কুল করিয়া বহিয়া যায়, কোন্ ঘাটে ভাগ্যবান্ ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দিয়া ছিল,—সুদূর ফরাসীদেশে বসিয়া—বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্লাবিত-প্রায় সেই স্থানে বসিয়া—তিনি বঙ্গের এই সমুদয় সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন, ও না-জানি কত আনন্দই পাইতেন! বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর, তাহা তিনি ভার্‌সেল্‌সে বসিয়া কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাইতেন। জন্মভূমি যশোর সাগরদাঁড়ীর অনতিদূরে নদীতীরে বট-বৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পর্য্যটকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সমুদয় তিনি সাগরপারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল। "বাংলার ফুল, বাংলার ফলে,—বাংলার মাটী, বাংলার জলে" ৫৬ তাঁহার অন্তর-বাহির ভরপূর হইয়া গিয়াছিল। ফরাসীদেশে বসিয়া তিনি যমুনার কথা ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন:

"আর কি কাঁদে লো, নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর তীরে খসি
অশ্রুধারা মুকুতার কমরূপ ধরি?" "

বলিয়া তাঁহার মধুর বাঁশরী বাজাইতেন। কতকাল হইল বঙ্গের কবিকুঞ্জ মধুহীন হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি যেন সে বাঁশীর সুর বাঙ্গালার বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। 'শ্যামা' বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন—

"মধুহীন করো নাক তব মন-কোকনদে।"

তাঁহার সে প্রার্থনা সফল হইয়াছে। বঙ্গভূমি বক্ষের উপর মধুর স্মৃতি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যত দিনের পর দিন যাইতেছে, ততই মধুর মধুর কবিতার রসে বঙ্গ অধিকতররূপে নিমগ্ন হইতেছে।

সভ্যবৃন্দ, কৃত্তিবাস কাশীদাসের দেশে, রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের দেশে, জয়দেব মুকুন্দরাম চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের দেশে মধুসূদনের জন্ম; যে দেশের নির্ম্মল আকাশে বলাকার খেলা, শ্যামল বনানীতে শ্যামা দোয়েলের সঙ্গীত, সুনীল তটিনীতে দাঁড়িমাঝিদের সারি-গান, সেই দেশে মধুসূদনের জন্ম; যেখানে সায়ংকালে নদীতীরে বটবৃক্ষের মূলে বসিয়া রাখাল-বালক

"হরি, বেলা গেল সন্ধ্যা হল' পার কর আমারে—"

বলিয়া গান ধরে, নদীর কুল কুল গীতিকার সহিত সেই রাখাল-সঙ্গীত মিশিয়া ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে মিলাইয়া যায়,—মধুর সেই দেশে জন্ম; তাহার উপর আবার সম্ভ্রান্ত বংশের অবতংস, ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাংশে তদানীন্তন সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সকল রকমেই স্পৃহণীয় অবস্থায় অভিজাত ও অবস্থাপন্ন পিতামাতার আদরের পুত্র মধুসূদন পরিবর্দ্ধিত। সর্ব্বোপরি, বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদে বাগ্‌দেবতার কৃপামৃত তাঁহার উপর বর্ষিত। রাজরাজেশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডারেও যে রত্ন নাই, শত শত সাম্রাজ্য-বিনিময়ে যে রত্ন লাভ করা যায় না, সেই সর্ব্বোত্তম কবিত্ব-রত্নের অম্লান মালা বীণাপাণি স্বহস্তে তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন,—সুতরাং তাঁহার সমকক্ষ কে ?

শুভক্ষণে মধুসূদন ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে বাগ্‌দেবতার চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"..............অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি ! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
... ...
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি !
... ...
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর

কাব্যরত্নাকর কবি !.........
.........উর তবে, উর দয়াময়ি,
বিশ্বরমে ! গাইব, মা ! বীররসে ভাসি
মহাগীত ; উরি দাসে দেহ পদচ্ছায়া।” ৫৮

মধুসূদনের প্রার্থনায় বীণাপাণি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মায়ের বীণায় পুত্র স্বরসংযোগ করিতে পাইয়াছিল। পুত্রের জীবন সার্থক হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে তদ্দেশ-বাসী বলিয়া এবং সেই কবি যে ভাষার দিবাকর-কল্প, সেই ভাষার সেবক বলিয়া আমরাও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার বিরচিত মধুচক্রে গৌড়জন দিবা-রজনী আনন্দে মধুপান করিতেছে ও করিবে। বঙ্গভাষাকে তিনি যে অনর্ঘ সম্পদে সাজাইয়া গিয়াছেন, যে “কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভায়” বঙ্গভাষাকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মহিমা কোনও দিন ক্ষুণ্ণ হইবে না। বঙ্গকবিতা-সাম্রাজ্যে তিনি সম্রাটের ন্যায় আসিয়াছিলেন, সম্রাট্-জননীর যেমন হওয়া উচিত, তেমনি ভাবে, বুঝি-বা ততোধিক রূপে, বঙ্গভাষাকে সাজাইয়া গিয়াছেন। কালের নিরঙ্কুশ বিধানে কত-কি ভাঙ্গিবে-গড়িবে, কিন্তু মধুসূদনের কবিত্ব-প্রতিমার জ্যোতি দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইবে বই ম্লান হইবে না। মধুসূদনের জন্মে বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের মর্য্যাদাবৃদ্ধি হইয়াছে; আর তাঁহার ন্যায় একজন জাতীয় মহাকবিকে বৎসরান্তে

অন্ততঃ একটি দিনও আমরা পূজা করিতে আসি বলিয়া আমরাও ধন্য হইতেছি।

আহা!

"বঙ্গভাষা সুললিত কুসুম-কাননে
কত লীলা করি,
কাঁদাইয়া গৌড়জন, সে কবি মধুসূদন
গিয়াছে,—বঙ্গের মধু বঙ্গ-পরিহরি।

যাও তবে কবিবর, কীর্ত্তিরথে চড়ি,
বঙ্গ আঁধারিয়া;
যথায় বাল্মীকি ব্যাস, কৃত্তিবাস কালিদাস,—
রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া
কবিতা-ভাণ্ডারে,
অনন্ত কালের তরে, গৌড়মন-মধুকরে
পান করি, করিবেক যশস্বী তোমারে।"[১]

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি *

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশের ভাষা পূরে কি আশা ?"

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে,—বাঙ্গালী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা বা প্রত্যবায়জনক মনে করিতেন, সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বহু মনস্বী বঙ্গসন্তান বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দির-রচনায় সাহায্য করিয়াছেন; রাজা রামমোহন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দির-গাত্র নানাবিধ শিল্পসৌন্দর্য্যে খচিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন বাঙ্গালীর একটী প্রকৃত স্পর্দ্ধার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহা-বংশের ভগ্নাংশ, সেই প্রাচীন আর্য্য জাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্ন-রাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয় সাহিত্য-গঠনে সম্পূর্ণরূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাঙ্গালী এখন বঞ্চিত নহে,—এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার যতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বর্দ্ধিষ্ণু বঙ্গবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত, এ কথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

ক্ষেত্র-কর্ষণ পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ-বপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা অঙ্কুরিত বীজের রক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধন অধিকতর পরিশ্রম-সাধ্য ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। অঙ্কুরিত শস্যের আপদ্ অনেক। সেই সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়ই দক্ষতা-সাপেক্ষ। যে সময়ে জল-সেচনের প্রয়োজন তখন জল, যখন আতপ-নিবারণের প্রয়োজন তখন, ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোন একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্যশালিনী হইতে পারে না। বর্ত্তমান

সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও ঐ রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। এখন দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই সুফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপনয়নে চাহিতেছেন;—কত উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি-ও আদর-সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; এমন সময়ে—দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে—ঐ কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পূর্ব্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসিমাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য। এত দিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাটীরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যদ্-বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে তাহা যেন নষ্ট না হয়,—তাহার উর্ব্বরতা যেন কতগুলি আবর্জ্জনা-জনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

"বিশেষ বিবেচ্য" কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি। এত কাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্দ্ধ শতাব্দী

ধরিয়া বঙ্গভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল, এখন বঙ্গভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ছিল, যাঁহারা শিক্ষিত—কি প্রতীচ্য কি প্রাচ্য এই উভয়বিধ শিক্ষার কোন একটিতে যাঁহারা সম্পন্ন—বঙ্গভাষার কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ কেবল তাঁহাদের—সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের—অবসরবিনোদনের উপাদান মাত্র হইত। কার্য্যান্তরব্যাবৃত্ত চিত্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে যাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? একপ্রকার ছিলই না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস-কাশীদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্য-রথের নাম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত জনসঙ্ঘের সংখ্যা সাত কোটী[৬১] বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতিরঞ্জিত হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দিন আবদ্ধ ছিল, এখন সেই বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্রগতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত-চরণে চলে, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের

উদ্বোধন-কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর সেই সঙ্গেই, আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে। কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট্ সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি,—সর্ব্ব প্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ব্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে অসঙ্কোচে "জাতীয় সাহিত্য" বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে, যখন বঙ্গভাষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি অল্পবিস্তর নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ ভাষার গতিকে, বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুকূল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। জাতীয়তা-গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য-গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন্ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে "শিক্ষিত" বলিতে আমরা কি বুঝি? সর্ব্বসাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে "শিক্ষিত"

বলিয়া স্বীকার করে? বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র বিশ্ববিত্থালয়। যাঁহারা বিশ্ববিত্থালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, দেশবাসিগণ অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও যাঁহারা পরম যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অধ্যাপকবর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন; যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তর-কালেও তাঁহারা সে উচ্চাসনের অধিকারী থাকিবেন সত্য, কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রায় প্রতি পল্লীতেই বিশ্ববিত্থালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যে স্থানে হয়ত পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্ত্তমানে সে স্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। যেরূপ ভাবে গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্ত্তী সময়ে যেখানে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব এমন পল্লী বঙ্গে থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জনসাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিতগণের হস্তেই ক্রমে ন্যস্ত হইবে।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপট ভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লীবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকটে অনেক আশা করেন। যে যে পল্লীতে তাঁহাদের বাস, সেই সেই পল্লীতে এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা দায়ী, কেন-না লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না—সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণপূর্ব্বক, যদি তাঁহারা বিবেচনা-সহকারে লোক-মত পরিচালনা করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অম্লান মনে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে গুণ থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতগণকে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয়তা, বিনীতভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে, বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাকেই শিক্ষার চরমফল-প্রাপ্তি বলিতে পারি না।

স্বজাতিকে আত্মমতের অনুকূল করিতে পারিলে সর্ব্বাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক, বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল-সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্য্যের যেমন একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকিলেও কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়,—সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা-গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য-গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশ মত কোন ভাবুক ভাবের স্রোতে ভাসিয়া দু'একটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দু'একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একাগ্রতাপূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায়ও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার নিহিত। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে

কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজী শিক্ষিতগণ যদি একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিতকল্পে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফলের আশা অনেক। দেশের যাঁহারা উচ্চ শিক্ষাবর্জ্জিত, সেই জনসাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহ-সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন-না, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে সাধারণ মত গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উদেযাক্তা বা এক হিসাবে কর্ত্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ঐ মাতৃভাষাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা ইংরাজী শিক্ষিতগণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কেন-না তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন; লোকসমাজের স্পৃহণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন,—তাঁহাদের কথার, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের, তাঁহাদের আচরিত রীতিনীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্ব স্ব মতের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির—উদীয়মান জাতিরও—স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।" ৬২

এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পদক্ষেপ করিতে হইবে। তরণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক, অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

যাহারা বঙ্গের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। তাহাদিগকে —সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে—সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ তাহাদিগকে অসৎপথে—উৎসন্নের পথে অধঃপাতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরল-বিশ্বাস-সম্পন্ন জনসঙ্ঘের চিত্ত শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকচক্যে বশীভূত করিয়া যে দিকে ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ্ এবং বিপদ্—এই দুই-এরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ্-বিপদ্ উভয়ই নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎ পথেই লইয়া যাইতে হয়—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়—বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্ম-সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ,—আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্ব-সাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্ত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। দু'একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু-না-কিছু আছে। বর্ত্তমান কালে ইউরোপ জগতের অভ্যুদিত দেশসমূহের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক দেখিতে হইবে যে, কেমন করিয়া, কোন্ শক্তির বলে, বা কোন্ গূঢ় কারণে ইউরোপের কোন্ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে; কোন্ পথে পরিচালিত হওয়ায় কোন্ জাতির কি উন্নতি

হইয়াছে,—সেই উন্নতির কারণ এবং পথ, আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কি-না, তাহার প্রয়োগে আমাদের এ দেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা,—ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয়, এ দেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পথে আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনের একমাত্র সহজ পথ,—ঐ সকল কারণ, ঐ সকল উপায়-প্রণালী অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এই প্রচারের একমাত্র কর্ত্তা যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাঁহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে, মাত্র তাঁহারাই,—অন্যে নহে।

দেশের কল্যাণ-কামনায় এবং স্ব মাতৃভাষার পরিপুষ্টি-বাসনায় যাঁহারা এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রচারকর্ত্তাদের সামান্য ত্রুটীতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেশের শিক্ষিতগণের প্রতি পদবিক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন্ দুর্নীতির আশ্রয়-বশতঃ ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত

ঘটিয়াছে, বা ঘটিতেছে—সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্ম্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে—পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছ দর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রতিবিম্বনপূর্ব্বক দোষ-পরিহার ও গুণ-গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইবে।

ইহ কালই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। এই ইহ কালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া কার্য্য করার ফলে, ঐহিকবাদী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়। ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বর্ত্তমান শোণিত-তরঙ্গিণী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্য্যস্ত। ইউরোপের ঐ অসদ্ভাবের অর্থাৎ ঐহিকবাদিতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বরং যতটা সম্ভব, উহা হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া আমাদিগের জাতীয়তা ও চিরস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবকে জাগ্রৎ রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশপূর্ব্বক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। যাহা আছে, মাত্র তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ দুর্দ্দিনে জাতীয় সম্পদের যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বপ্রকারে তাহা করিতে হইবে।

তারপর ইউরোপের সাধারণ সাহিত্য, অর্থাৎ কাব্য-নাটকাদি। আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের এই অংশে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত প্রভৃতি জটিল বিষয়সমূহের আলোচনা অপেক্ষা এই সমুদয় আপাতরম্য কাব্য-নাটকাদির আলোচনায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের অনেকেই কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তারুণ্যের অরুণ-আভায় এই সকল বিদেশীয় চিত্র প্রথমতঃ বড়ই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়—হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিশেষ প্রণিধান-সহকারে দেখা দরকার যে, পাশ্চাত্ত্য সমাজের চিত্র তদীয় জাতীয় কাব্য-নাটকাদিতে কি ভাবে প্রতিফলিত। ইউরোপের সামাজিক চিত্রাবলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হাবভাব বিন্যাস-কৌশল প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য কি-না,—ঐ ঐ চিত্রাবলীর আদর্শে যদি আমরা স্বকীয় সমাজ-চিত্রের ছায়াপাত করি, তবে তাহাতে আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি-না, অথবা ঐ বিদেশীয় চিত্র আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য কি-না,—এই চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া ইউরোপীয় কাব্য-নাটকাদি পাঠ করিয়া, উহার যে সকল অংশ উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এবং কল্যাণ-জনক, সেইগুলি আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতে হইবে; সাধারণের মানস সম্পদের উৎকর্ষ-বিধান করিতে হইবে।

এইরূপ করিতে পারিলে, আমার মাতৃভাষারও লাবণ্য বর্দ্ধিত হইবে। যাহা সৎ, যাহা সাধু, নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ, তাহা যে জাতির বা যে সমাজেরই হউক না কেন, সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে।

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।" ৬৩

এই ভাবে জাতীয় সাহিত্য যদি গঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের সাহায্যেই আমাদের নবজাতা জাতীয়তা সুগঠিত হইবে এবং জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত আমরা সমকক্ষতা করিতে পারিব,—অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। ইতিহাস এবং কাব্য-নাটক-উপন্যাসাদি-সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, ইউরোপীয় দর্শন এবং অপরাপর কলা (art) প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। যাহা কিছু বিদেশীয় তাহাই উত্তম, সুতরাং আমাদের গ্রাহ্য, বা যাহা কিছু বিদেশীয় তাহাই অস্পৃশ্য, সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাজ্য,—এরূপ কথা বলিতে আমি সাহস করি না। বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বুঝি না,—যাহা উত্তম, তাহা যে দেশীয়ই হউক না-কেন সর্ব্বথা গ্রাহ্য; আর যাহা সর্ব্বথা দোষমুক্ত নহে, তাহা আত্ম-পরজ্ঞান বর্জ্জনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সোজা পথ ছাড়া, ইহার অন্য কোন সমাধান জাতীয় সাহিত্যের বা সমাজের অনুকূল হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

এমন অনেক প্রথা থাকিতে পারে, অথবা আছেও, যাহা ইউরোপীয় সমাজের কতকটা অনুকূল হইলেও আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেরূপ প্রথার প্রচলনে প্রয়াস করা যে কেবল পণ্ডশ্রম তাহাই নহে, তাহাতে আমাদের স্মরণাতীত কাল হইতে সুসংবদ্ধ সমাজেরও বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা;—যেমন ইউরোপীয় বিবাহ-পদ্ধতি। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে উহা যতই সুন্দর ও আপাত-রম্য মনে হউক না-কেন, এ দেশের অস্থিমজ্জার সহিত যে সংস্কার অবিভাজ্যরূপে বিজড়িত, ঐ বিবাহ-পদ্ধতি সেই সংস্কারের এবং সেই সংস্কার-পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত সমাজের পক্ষে কদাচ হিতকরী হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশী পদ্ধতির ঐন্দ্রজালিক চিত্রে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করা অনুচিত। যাহা তোমার সমাজের বা জাতীয়তার পরিপন্থী, তাহাকে আড়ম্বরপূর্ণ সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তোমার স্বজাতির আপামর সাধারণকে মজাইও না। মনে রাখিও, তুমি যে পথ আজ নির্ম্মিত করিয়া যাইতেছ উত্তর-কালে তোমারই দেশের শত সহস্র যাত্রী সেই পথে গমনাগমন করিবে। সুতরাং আপাত প্রশংসার ও যশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যাহা তোমার স্বজাতির এবং স্বসমাজের হিতকর তাদৃশ চিত্র অঙ্কিত কর, তাদৃশ আদর্শ তোমার সাহিত্যের মন্দিরে স্থাপিত কর,—

যাহার অনুকরণে তোমার ভবিষ্যৎ জাতি সমুন্নত হইবে। তোমার যে বিবাহ-পদ্ধতি আছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির পদ্ধতি অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; সুতরাং ঐ উৎকৃষ্ট পদ্ধতির যে যে অংশ অশিক্ষিত, সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ জনসমাজে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুবোধিত হয় নাই, তাহা তোমার বঙ্গসাহিত্যের সাহায্যে ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত কর; এবং পার ত তোমার সেই উৎকৃষ্ট চিত্রের সম্মুখে বিদেশীয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া তুলিয়া ধর। তুলনায় তোমার স্বজাতিকে বুঝাইয়া দাও যে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা তোমার পক্ষে গ্রাহ্য ও তোমার সমাজের অনুকূল। মোহের ঘোরে যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত, তাহার যাহাতে মস্তক শীতল হয়, সেইরূপ ভৈষজ্যের বিধান কর। যাহাতে রোগ-বৃদ্ধি হয়, তোমার জাতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থে তাদৃশ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সমাজকে উৎসন্ন করিও না। তোমার প্রাচীন শাস্ত্র-ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি স্তূপীকৃত রহিয়াছে, এখনও যাহাদের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই—মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণে এখনও যে সমুদয় রত্নের অতুল কান্তি নিরীক্ষণ করে নাই—তোমার জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে সেই সেই রত্নের মালা গাঁথিয়া তোমার স্বজাতির কণ্ঠে পরাইয়া দাও;

তাহাদিগকে বুঝিতে দাও, শিখিতে দাও, দেখিতে দাও এবং দেখিয়া তুলনা করিয়া ভালমন্দ বাছিয়া লইতে দাও; দেখিবে, তাহারা এ দেশের অপরাজিতা বা শেফালিকা ফেলিয়া অন্য দেশের ভায়লেট্ মাথায় করিবে না। নিজেদের কি আছে, কি ছিল, ইহা যাহারা না জানে তাহারাই পরের দ্বারে উপস্থিত হয়। তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তোমার প্রাচীন সম্পদের পরিচয় দাও, বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও,—তাহাদের মনে আত্মসম্মান উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল। তবেই ত তোমার জাতীয়তা গঠিত হইবে। সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন কর, তবে ত জাতির গঠন হইবে—নতুবা সমস্তই আকাশ-কুসুম।

মনে কর, বিলাতের ব্যবস্থাপক-সভা (বা পার্লিয়ামেণ্ট); তোমার দেশের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ সভার উপযোগিতা কতদূর, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু বিলাতের লোক-তন্ত্র যেরূপ ভাবে গঠিত, তাহার পক্ষে ঐ সভার উপযোগিতা প্রচুর। সে দেশের পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাই যে এ দেশের পক্ষেও আবশ্যক, ইহা বলা বড়ই দুষ্কর। দেশভেদে, দেশবাসিভেদে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে এবং দেশের শিক্ষা-দীক্ষার ভেদে, দেশের পরিচালন-সভাসমিতিরও ভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তোমার দেশের পক্ষে তোমার প্রাচীন পদ্ধতিই অনুকূল, না বিদেশীয় পদ্ধতি অনুকূল;

তাহা বিশেষ বিচার করিয়া তোমার জাতীয় সাহিত্যের দর্পণে, ঐ উভয় ছবিরই দোষগুণের আলোচনা কর এবং দেশবাসীদিগকেও বুঝিয়া লইতে দাও যে, কোন্‌টা তাহাদের গ্রাহ্য। মুক্ত পুরুষের ন্যায়, আর্ষ প্রকৃতির ন্যায় নিরপেক্ষ হইয়া লোকের হিতকামনায় সাহিত্য-গঠন কর,—দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে। ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আদর্শে যদি তোমার স্বদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাও, মনে রাখিও, বর্ত্তমান সময়ে তোমার আশা বিফল হওয়াই সম্ভব। হৈমন্তিক শস্যের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত তাহাতে আশু ধান্যের বীজ-বপনে মাত্র কৃষকের মনস্তাপের বৃদ্ধি হয়, আর সেই সঙ্গে বীজ-ধ্বংস ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে দেশের শাস্ত্রে, শিক্ষায়, দীক্ষায় ও রাজনীতিতে রাজা মানব নহে—পরন্তু দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির ছায়াপাতে সেই দেবতাকে আবার মানবের আসনে অধঃপাতিত করিও না। তোমার প্রাচীন রাজনীতির উজ্জ্বল চিত্র উত্তম-রূপে নিজে নিরীক্ষণপূর্ব্বক, প্রতিভার সাহায্যে তাহা তোমার মাতৃভাষায় আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্ত্য রাজ-নীতির সহিত তুলনায় সর্ব্বসাধারণকে বুঝিতে দাও যে, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজনৈতিক ধারণা কত উচ্চ ছিল। গুপ্তহত্যা, রাজবিদ্বেষ এবং রাজদ্রোহ, কেবল ঐহিক নহে, পারত্রিক অকল্যাণেরও

আকর, এ কথা তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছে।

যদি এই সকল কঠিন সমস্যা মাতৃভাষার সাহায্যে সমাধান করিতে পার, তবেই প্রকৃতপক্ষে তোমার মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইবে, তোমার জ্ঞানার্জ্জন সার্থক হইবে, আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার সেবা করিয়া তোমার জন্মও সার্থক হইবে। অবশ্য এই কঠিন কার্য্য এক সময়ে, বা একের দ্বারা কদাচ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই পথে যদি একবার তোমার জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তবে দেখিবে, আরও কত পথিক তোমার প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে। পথ যদি উত্তম, সুগম এবং সুশীতল ছায়া-সম্পন্ন হয়, তবে তাহাতে কোন দিনই যাত্রীর অভাব হয় না। যাহা ভাল, নিষ্পাপ এবং নির্দ্দোষ তাহার সেবা কে-না করিতে চায়? সেই সেবায় সেবিতের লাভালাভ কিছুই নাই, কিন্তু সেবকের আত্মতৃপ্তি অপরিসীম। এই গুরুতর কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠাতৃগণের মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল অন্ধভাবে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুবাদে বা মাত্র তাহার উজ্জ্বল অংশের প্রদর্শনেই আমাদের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনপূর্ব্বক তাহার অসদংশের বর্জ্জন করিয়া

সদংশ, যাহা এ দেশের অনুকূল এবং যদি তাহাতে কোনরূপ দোষলেশ না থাকে, তবে তাহাকেই আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রহণযোগ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষা আশাতীত ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় অল্পজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এ দেশবাসীরা ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার উত্তম ফলে বঞ্চিত থাকিবে না, প্রত্যুত ক্রমেই তৎ তৎ ফলে সম্পন্ন হইবে। প্রাচীন জাপান এই উপায়-বলেই অধুনাতন নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই একটা বিষয়ে সর্ব্বদা আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অশ্বের উপরে নর্ত্তনাদি করিয়া যাহারা দর্শকদিগের প্রীতি ও কৌতুক উৎপাদন করে, তাহারা যেমন প্রধানতঃ সর্ব্বদাই স্মরণ রাখে যে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে স্খলিত না হই,—তদ্রূপ আমাদিগকেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা এই কার্য্য করিতে যাইয়া যেন স্খলিত না হই, অর্থাৎ আমাদের যাহা মজ্জাগত সংস্কার, সেই পবিত্র ধর্ম্মভাব হইতে যেন বিচ্যুত না হই।

আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির কোনটিই ধর্ম্মভাবশূন্য নহে। ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এমনই

একটা গুণ আছে যে এখানে ধর্ম্মভাববর্জ্জিত কোন বস্তুই স্থায়ী হইতে পারে না,—এ পর্য্যন্ত পারে নাই। যাহাদের আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের কোনও চিত্র যদি ধর্ম্মভাব-ব্যঞ্জক না হয়, তবে তাহা কদাচ বাণীর পাদপদ্মে অর্পণ করা যাইবে না। সে চিত্র গোধূলি-গগনের লোহিত মেঘখণ্ডের মত অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি, কর্ণ যাহাদের সাহিত্যের আদর্শ পুরুষ; কবিগুরু রত্নাকর, মহর্ষি দ্বৈপায়ন, কবিকুল-রবি কালিদাস, ভবভূতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্য-সঙ্গীতের গায়ক;—আর সর্ব্বোপরি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যাহাদের শ্রৌতসঙ্গীতরূপ অমৃতের নির্ঝর, তাহাদের নবীন জাতীয় বঙ্গসাহিত্যে কোনরূপ অপবিত্র ভাব বা অনাচার যেন প্রবেশ না করে—তৎপক্ষে সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন। সকল জাতিরই এক একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক—আছেও। লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্যুদয়শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে যে জাতি অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটা-না-একটা স্থির লক্ষ্য ছিল; এবং সেই লক্ষ্য

ধরিয়াই তাহারা ক্রমে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিয়াছে। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে কিছুই অসম্ভব নহে,—অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে।

এই যে ইউরোপ এত অতুল ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিতে সম্পন্ন, ইহার কারণ কি? অর্থ বা অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। আজ যে জাপান এত উন্নত, ঐ অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি আছে বলিয়াই অন্য কোন বাধা-বিপত্তিতে উহাদিগকে ব্যাহত করিতে পারে না। লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য প্রাণকেও উহারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়াই, ধর্ম্মপ্রাণ অগ্নি-উপাসকগণ অম্লান বদনে ইরান ছাড়িয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন,—পিউরিটানেরা মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমেরিকার গহন বনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে যে জাতি যে যে বৃহৎ কার্য্যই করুক না কেন, তাহার মূলে কিন্তু একটা স্থির লক্ষ্য থাকা চাই। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের এই জাতীয় সাহিত্যের মন্দির-নির্ম্মাণেও একটা স্থির লক্ষ্য আবশ্যক; অন্যথা আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। আমাদের সেই লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? কোন্ লক্ষ্যে স্থিরচিত্ত থাকিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিয়া-

ছিলেন? কোন্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমরা ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি? ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য ও বিবেচ্য।

ভারতবর্ষ যে এত উন্নত হইয়াছিল, সে একমাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া। যদি ভারতকে আবার বড় করিতে চাও, যদি আবার তোমাদের লুপ্ত সম্পদের, বিনষ্ট সম্মানের পুনরধিকার চাও, তবে সেই পিতৃপিতামহের লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির কর। একাগ্রচিত্ত হও, অবাধে তোমার অভিপ্রেত মৎস্য-চক্র-ভেদ করিতে পারিবে। ধর্ম্মভাব হিন্দু জাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্ম্মভাবকেই তোমার বর্ত্তমান জাতীয়তারও প্রধান লক্ষ্য কর। তোমার সাহিত্য, তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার, ব্যবহার সর্ব্বত্রই সেই ভারতস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ কর। দয়া, সমবেদনা, পরার্থপরতা, সত্য, তিতিক্ষা, প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে তোমার সাহিত্য-কানন যদি সম্পন্ন করিতে পার, তবেই তোমার জাতীয় অভ্যুদয় হইবে। অন্যথা যাত্রার দলের প্রহ্লাদের ন্যায় তুমি ভক্তির ভান করিবে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তোমার কোনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ ও নির্ভর একত্র করিয়া যদি জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে পার, তবেই দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে।

এই ভাবে অন্যের সুচারু ও সদ্ভাবপূর্ণ পদার্থ লইয়া নিজের জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ ও জাতীয় আদর্শের গঠন ইতিপূর্ব্বেও হইয়াছে। বরঞ্চ ইতিপূর্ব্বে অতি প্রবলরূপেই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের নিজের জাতীয় সম্পদ্ আমাদের প্রাচীন সম্পদের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে ছিল না; আমাদের সহিত তুলনা করিলে রোমের প্রাচীন সম্পদ্ গণনার মধ্যেই পড়ে না। রোমে যখন জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ হইল, তদানীন্তন প্রধান জাতির অভ্যুদয়দর্শনে রোমবাসীদের হৃদয়েও যখন জাতীয়তা-গঠনের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, জগতে বরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় রোমবাসিগণের অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা মাত্র নিজের পরিমিত প্রাচীন সম্পদেই আর পরিতুষ্ট থাকিতে পারিল না,—পিপাসার্ত্ত হইয়াই যেন চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তখন গ্রীসের চরম উন্নতির সময়। সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বাংশে গ্রীস তখন জগতের একটা আদর্শ জাতি। বীরত্বে ধীরত্বে, জ্ঞানে সম্মানে গ্রীস তখন সকলের শ্রেষ্ঠ। গ্রীসের সেই চরম অভ্যুদয়ের সময়ে রোমের লোলুপ দৃষ্টি গ্রীসের প্রতি পতিত হইল। গ্রীসের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য,—গ্রীসের কলাবিদ্যা,—গ্রীসের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই রোম ক্রমে স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া

লইতে লাগিল। গ্রীসের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই রোম নিজের জাতীয়তা-গঠনের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে রোম গ্রীসের সমকক্ষ, এমন কি, অনেকাংশে গ্রীস অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রীসের অনুকরণ করিতে যাইয়া কিন্তু রোম স্বীয় জাতীয়তা বিসর্জ্জন করে নাই। গ্রীসের যাহা কিছু উত্তম পরিচ্ছদ, যাহা কিছু সুন্দর অলঙ্কার, তাহা রোমের জাতীয় ছাঁটে ছাঁটিয়া, জাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া রোম পরিধান করিল, এবং নবীন সাজে সাজিয়া রোম যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, তখন রোমের সেই নানারত্ন-খচিত কিরীটের প্রভায় প্রাচীন গ্রীস যেন কতকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। প্রাচীন গ্রীসের অঙ্গে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে সমুদয় জরাজনিত পলিতভাব জন্মিয়াছিল, যাহা কিছু অসুন্দর ছিল, তাহার পরিবর্জ্জন করিয়া রোম গ্রীসকে যেন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। রোমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের মস্তক অবনত হইল।

কিন্তু এই গ্রীস-রোমের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। রোমীয়দিগের নিজের প্রাচীন দ্রব্য-সম্ভার তত অধিক ছিল না, তাহাদের গৃহ একপ্রকার শূন্য ছিল, হয়ত গৃহের কোন এক কোণে দু'একটি প্রাচীন পদার্থের কঙ্কাল মাত্র পড়িয়া ছিল, তাই

রোমীয়গণ দু'হাতে গ্রীসের যতটা পারিয়াছে দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া নিজের শূন্যপ্রায় গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছে,—তত সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হয় নাই।

আমাদের কথা ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আমাদের প্রাচীন সম্পদ্ প্রচুর। তাহার ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। আমাদের যাহা আছে, তাহার কোন একটিরও মর্য্যাদার হানি হইতে পারে, এমন কোন পরস্ব আমরা কদাচ গ্রহণ করিব না। অথচ আমাদের যাহা নাই—অন্যের প্রচুর আছে, সেইরূপ পদার্থ, যদি আমাদের জাতীয়তার পরিপন্থী না হয়, তবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিব না। রোমের ন্যায় আমাদের গৃহ শূন্য নহে যে, যে ভাবে পারি গৃহ পূর্ণ করিব; আমাদের ঘর পরিপূর্ণ। সেই পরিপূর্ণ গৃহের শোভা-বৃদ্ধির পক্ষে যাহা অনুকূল, সেই পরিপূর্ণ গৃহের অনুরূপ যে সাজ-সরঞ্জাম, তাহা যদি অন্য কোন জাতির নিকটে পাই, তবে অম্লান হৃদয়ে গ্রহণ করিব। যাহা আমার জাতীয়তার অনুকূল নহে, তাহা কদাচ স্পর্শও করিব না। আমার নিজের জাতীয়তায় কোনরূপ কলঙ্ক-স্পর্শ হইতে পারে, এরূপ আবর্জ্জনা কদাচ আমার জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গে জন্মিতে দিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিবেচনার সহিত পাদক্ষেপ করিতে পারি, কিংশুক পরিহারপূর্ব্বক কমল চয়ন করিতে পারি, তবেই আমাদের জাতীয়তা

অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সম্পদ্, এই দুই-ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে—বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

আমাদের যাহা নিজস্ব, যাহা লইয়া আমরা গৌরব করি,—আমাদের সেই জাতীয় গৌরবের বস্তু,—প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-কলা, দর্শন-ইতিহাস প্রভৃতির যাহাতে কোনরূপে অঙ্গহানি ঘটে, এরূপ কার্য্য যেন আমরা কদাচ না করি,—কদাচ যেন জাতীয়তা বিসর্জ্জন না দিই। অথচ যে ভাবে হউক, যদি ঐ সকল বস্তুর কোনক্রমে কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারি, তবে তাহাতে যেন বদ্ধপরিকর হই। নিজের যাহা আছে তাহা ত আছেই, কেহ তাহা অপহরণ করিতেছে না; সুতরাং সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিয়া যাহা অন্যের আছে, অন্যে যাহার বলে বলীয়ান্, অথচ আমার নাই, তাহা পাইবার জন্য যদি আমার আন্তরিক আগ্রহ না জন্মে, তবে কদাচ আমি ঐ বলবানের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিব না। কেবল পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বের অতীত সম্পদের আলোচনা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কোনই ফলোদয় হয় না। নিজের জাতীয় জীবনের শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার প্রয়াস স্বতঃ পরতঃ করিতে হইবে,—শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।

আমার এই ছিল, আমি এই ছিলাম,—এইরূপ ব্যর্থ ও অলস চিন্তায় কোনই লাভ নাই, বরং ক্ষতিই অধিক।

এই ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারি, তবেই আমাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে,—আমরা এই ঘোর দুর্য্যোগেও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত, তাহা উরগ-ক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া যাহা সুন্দর, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, মনোহর,—যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সদ্ভাব-পুষ্প চয়ন করিব এবং সেই সদ্ভাব-কুসুমে আমার জননী অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃতা করিব,—মায়ের সন্তান আমরা, মাতৃপূজা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

যে বায়ু মধুকণা বহন করে না তাহা আমরা আঘ্রাণ করিব না, যে নদী মধুমতী নহে তাহার আমরা সেবা করিব না, যে লতা মধুময় কুসুমে কুসুমিত নহে, তাহার প্রতি আমরা চাহিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের অনুকূল হইবে—সহায় হইবে। নিঃসপত্নভাবে আমরা পর্ব্বোদিত চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিব। হিমাচল যে দেশের পর্ব্বত, জাহ্নবী-যমুনা যে দেশের প্রবাহিণী, সাম যে দেশের সঙ্গীত, রামায়ণ-মহাভারত যে দেশের ইতিহাস, আমরা সেই দেশের অধিবাসীর যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব

আপনারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন—বঙ্গবাণীর চরণ-প্রান্তে বসিবার সুযোগ দান করিয়াছেন—তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশপূর্ব্বক আমি আবার বলি, আপনাদের ভাষা, আপনাদের ভাব, আপনাদের চিন্তা—এ সমস্তই সুন্দর হউক, অন্যের অনুদ্বেজক হউক ; যাহারা আপনাদের সন্নিকর্ষে আসিবে তাহাদিগকেও উন্নতির পথে লইয়া, আপনারা নিজে ভাগীরথার প্রবাহের ন্যায় অবাধিত গতিতে উন্নতির অমৃতময় পারাবারে মিশিয়া যাউন। নিজের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের বরেণ্য হউন। বিধাতার কৃপায়

"মধু ক্ষরতু তে বিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োঽস্তু তে॥" ১৪

বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ

"সাজাইতে মাতৃভাষা   সদা যার মনে আশা,
নাশিতে স্বদেশবাসি-অজ্ঞান-তিমির।
জন্মভূমি-জননীর   মুছাতে নয়ন-নীর,
দিবসযামিনী যার পরাণ অধীর ॥
রত্নপ্রসূ বসুধার সে রত্ন-সন্তান।
এ মর-ধরণী'পরে অমর-সমান ॥"

সমবেত সভ্যমণ্ডলী, দেখিতে দেখিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন দশম বর্ষে উপনীত হইল। বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ প্রতিবর্ষে কোন স্থানে সম্মিলিত হইয়া মাতৃভাষার চরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, নানা-রোগ-জর্জ্জর বঙ্গভূমির প্রিয়সন্তানবৃন্দ, এই সম্মিলনের তিন দিন, আপন আপন সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ,—সমস্ত একপদে বিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে সাধকের ন্যায় উপবিষ্ট হন, ইহা বাঙ্গালীর পরম মঙ্গলের কথা, শ্লাঘার কথা। মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন,—যাহার যেটুকু আছে,

সে যদি সেইটুকুতেই সুস্থ থাকে, অভ্যুদয়ের দিকে আর না তাকায়, তবে মনে হয়, বিধাতা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই তাহার আর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করেন না। সংসারী জীবের পক্ষে এ উক্তি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষা বর্ত্তমান কালে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কেন-না, যে সকল গ্রন্থকে স্তম্ভস্বরূপ আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষা এই প্রতিযোগিতা-সঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে অক্ষয়ত্ব লাভ করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষায় তাদৃশ গ্রন্থাদি তত অধিক পরিমাণে উপনিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং আমাদের নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বঙ্গবাসি-জনগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একটা তরঙ্গ উত্থিত থাকে, বাঙ্গালী হৃদয় কোন সময়ের জন্য নিস্তরঙ্গ, স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন-পর থাকিতে হইবে। বঙ্গভাষা-বিষয়িণী আলোচনা দেশের সর্ব্বত্র আরও অধিকতররূপে আরব্ধ করিতে হইবে।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকে বলেন,—এই সাহিত্য-সম্মিলনের কোন উপযোগিতা

নাই। বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা ব্যয় করায় ভাষার তেমন কি অভ্যুদয় হইয়াছে? এই দীর্ঘ দশ বৎসরে বাঙ্গালা ভাষার কোনই ত উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাই না। তবে এ আন্দোলনের আবশ্যকতা কি? —ইত্যাদি। যাঁহারা এই কথা বলেন, দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অনন্ত কালের সমক্ষে যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে দশ বৎসর বা দশ শত বৎসর নিমেষতুল্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। যদি আমরা আমাদের জাতীয়তা সঞ্জীবিত রাখিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে জাতায় সাহিত্য-গঠন আবশ্যক। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, বাঁচিবার উপায়-উপকরণগুলির প্রতি সর্ব্বদা সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে—ঔদাসীন্যে চলিবে না। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, এক হিসাবে তাহার কিছুই নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী জাতির যদি জগতে কালজয়ী হইবার বাসনা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য, বৎসরে একবার কেন, যদি প্রয়োজন বুঝা যায়, একাধিক বারও এতাদৃশ সম্মিলনের অধিবেশন অনভিপ্রেত নহে। চাই উৎসাহ, চাই উদ্যম। আমার মাতৃভাষাকে জগতের বরণীয় করিয়া তুলিব,—একা আমি নহি, আর দশজনেও যাহাতে আমার মাকে মা বলিতে

পারিলে নিজেকে ধন্য, কৃতার্থম্মন্য মনে করিবে, এমন ভাবে আমার মাকে গড়িয়া তুলিব, প্রাচ্য-প্রতীচ্য-নির্ব্বিশেষে আমার মার অধিকার প্রসৃত হইবে—এইরূপ ধারণা লইয়া যদি আমরা কাজ করিতে পারি, তবে আজ যাহা স্বপ্ন বা একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কালে তাহা করস্থ আমলকবৎ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং যাহাতে বঙ্গবাসীর মনে বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার স্পৃহা সতত জাগরূক থাকে, তজ্জন্য, এবং মধ্যে মধ্যে বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণের প্রীতি-প্রণয়ের আদান-প্রদানের জন্য এইরূপ সম্মিলন যে একান্ত আবশ্যক, ইহা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে।

বাঁকিপুর দশম সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ এই মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। যে স্থানে একদিন ভারতের তদানীন্তন একচ্ছত্র সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক বৌদ্ধ সঙ্গীতির আহ্বানপূর্ব্বক মগধের স্মরণীয় মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন,—যে পাটলীপুত্রের পুরাচিহ্নসমূহের সামান্য একটু অংশ-প্রাপ্তির জন্য ঐতিহাসিকগণ সতত উদ্‌গ্রীব,—ভারতের নবীন ইতিহাসের প্রতিপত্রে যে প্রাচীন নগরের স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে,—সেই পাটলীপুত্রে আজ বঙ্গের সারস্বতসেবকগণ সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর বিশেষ শ্লাঘার কথা, এবং অদ্যকার এই দিন, বঙ্গবাসীর তথা বঙ্গের ভবিষ্য জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয়

বস্তু। পার্থিব ব্যাপারে আজ বঙ্গ এবং বিহারের মানচিত্র পৃথগ্‌ভূত হইলেও অপার্থিব সারস্বত ব্যাপারে এই উভয় প্রদেশই যে একসূত্রে গ্রথিত, অদ্যকার এই সম্মিলন তাহার অন্যতম নিদর্শন।

এই জাতীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল মনস্বী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির পরিচয় নূতন করিয়া আমি আর কি দিব? সেই সকল সুযোগ্য সাহিত্যরথগণের স্পৃহণীয় আসনে আপনারা আমাকে বসাইয়া সেই মহার্হ আসনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এইরূপ কার্য্যে—বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের মহাসম্মিলনে—আমি সভাপতিরূপে কার্য্য করিব। আমি সাহিত্যিক নহি, বঙ্গবাণীর সেবকগণের যে গৌরব, আমি তাহার ভাজন হইবার যোগ্য নহি,—ইহা আমি যতটা জানি এবং বুঝি, বোধ হয় অন্যে ততটা জানেন না বা বুঝেন না। বঙ্গের যে সকল কৃতী সন্তান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণপণে এবং নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গভারতীর অর্চ্চনা করেন, সেই সকল মহাত্মাদের কোন কাজে, কোন উপকারে আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে চরিতার্থ হই। সভ্যগণ, আপনারা আমাকে সে সুযোগে বঞ্চিত করিয়াছেন। সাহিত্যসাধকগণের সেবা করিতে যাহার অভিলাষ, তাহাকে সাহিত্য-সাধন-যজ্ঞের ঋত্বিগ্‌রূপে

মনোনীত করায় উক্ত যজ্ঞের অগৌরব হইয়াছে এবং তাহার সে সাধেও বাদ সাধিয়াছেন।

প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃ-ভাষাকে যদি কোনমতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে! কিন্তু অপলাপে লাভ কি? যে সম্পদ্ থাকিলে, যে শক্তি থাকিলে, মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করা যায়, দুর্ভাগ্য আমি, আমার সে সম্পদ্ বা শক্তি নাই। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম, কবে এমন দিন আসিবে, যখন আমার শিক্ষিত দেশবাসিগণ আচারে ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায়, চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন হইবে! কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্রস্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা! কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না! আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত

হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভূত হয় যে, সে সুদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্যধ্যেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্ত্তমান! একদিকে, দেশের যাঁহারা ভবিষ্যৎ আশার স্থল, যাঁহাদের বিবেচনার উপর বঙ্গ-দেশের অদৃষ্ট নিহিত, সেই শিক্ষার্থী যুবকগণ আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজভাষার সহিত বঙ্গভাষারও আলোচনা করিতেছেন; আর দু'দিন পরে যাঁহারা ইচ্ছা করিলে তর্জ্জনীহেলনে দেশের লোক-মত পরিচালন করিতে পারিবেন, সেই যুবকবৃন্দ বঙ্গভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে! শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদল-বাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে! আর ঐ দেখ, অন্যদিকে যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সৌভাগ্যদেবতার আদরের সন্তান, তাঁহারাও বঙ্গভাষার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ।

কয়েক মাস পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে আমি জাতীয় সাহিত্যগঠন-প্রসঙ্গে বলিয়া-ছিলাম,

"দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎপথে লইয়া যাইতে হয়, মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহা জাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-

প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও, যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ-সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ, আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। [ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, বিদেশীয় আয়ুধেও সন্নদ্ধ হইতে হইবে।”]

সুতরাং জাতীয় সাহিত্য-গঠন-সম্বন্ধে অদ্য আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অদ্য আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য-গঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বদ্‌বৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে; এবং সেই চিন্তা-প্রসূত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। তবেই ত বঙ্গভাষা অমরা

লাভ করিবে! যদি এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গসাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ যেমন আমরা অনেক অনর্ঘ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় আবিষ্কৃত এবং উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্য মাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্য-শিক্ষণীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ ঐ বিষয়সমূহ এতাবৎকাল লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন।

যদি এমন ভাবে বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলে অপরাপর ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষাও শিখিতে হয়, এবং না শিখিলে অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়া যায় ও অন্য শত ভাষা শিক্ষা করিয়াও পূরা মানুষ হওয়া না যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চিরস্থায়িনী হইবে; বাঙ্গালার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে সমুন্নীত হইবে। অন্যথা বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার গৌরব বাড়িল কৈ? বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট্ সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্যতম

প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা যায়। কাল অনন্ত এবং পৃথিবী বিশাল, সুতরাং ব্যস্ততার কারণ নাই। ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ-পূর্ব্বক আমার জননী বঙ্গভাষাকে অনন্তকালরূপী অক্ষয়বটের ছায়াশীতল তলদেশে লইয়া যাইয়া বঙ্গের পূজনীয় ভাষাকে জগতেব পূজনীয় করিতে হইবে।

বিষয়টা আবও একটু বিশদ কবিতে চেষ্টা করা যাক। এক দেশের ভাষা অন্য দেশের লোকেব নিকট আদৃত হইবাব কাবণ প্রধানতঃ দুইটি,—একটি রাজনৈতিক কারণ, অপরটি ভাষায শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্য। বাজার জাতিব ভাষা না শিখিলে, রাজার জাতিব ভাষায় বিজ্ঞতালাভ না করিলে, নানারূপ অসুবিধা, সুতবাং বিজিত জাতির বিজেতার ভাষায অভিজ্ঞ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ধরিয়া লউন, আমাদের ইংবাজরাজ যদি আজ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইতেন, তাহা হইলে এই বিশাল পৃথিবীতে ইংরাজী ভাষাই প্রধানতঃ প্রচলিত হইত। সেরূপ কোনও সম্ভাবনা আমাদেব বঙ্গভাষার নাই, সুতরাং প্রথমোক্ত কারণে বঙ্গভাষা জগতেব ভাষা হইতে পারে না। কিন্তু রাজভাষা না হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক ভাষা দেখিতে পাই, যাহা পৃথিবীর অন্যান্য

দেশবাসীর নিকট অনাদৃত নহে, প্রত্যুত যথেষ্ট আদৃতই হইয়া থাকে—যেমন ইংরাজী ভাষা। সমগ্র পৃথিবী ইংরাজের রাজত্ব না হইলেও, অনেক স্বাধীন দেশেও এই ভাষার আদর দেখিতে পাই। এইরূপ রুষদেশীয় ভাষাও এমন অনেক দেশে যথেষ্ট সমাদৃত, যেখানে হয়ত এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একজনও রাষিয়ান দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের গর্ব্বের কারণ, ভারতবর্ষের স্পর্দ্ধার বিজয়-বৈজয়ন্তী সংস্কৃত ভাষা, অথবা ইউরোপের লাটিন এবং গ্রীক ভাষা কোন্ দেশে অনাদৃত? কোন্ মেধাবী ব্যক্তি এই সকল ভাষা শিখিয়া কৃতার্থ হইতে না চান? ফরাসী ভাষায় যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি আছে, তাহার অনুবাদমাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া, কোন্ আজীবন-ছাত্র মনস্বী উক্ত ভাষা অভ্যাস না করেন? এই সকলের কারণ কি? ঐ ঐ ভাষায় এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা না শিখিলে, সেই সেই বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ হইয়াছেন, এ কথা অবিসংবাদে স্বীকার করা যায় না।

মনে করুন, গণিত এবং রসায়নশাস্ত্র। রাষিয়ান ভাষায় গণিত এবং রসায়নশাস্ত্রের এত অধিক পর্য্যালোচনা ও গবেষণা আছে যে, সেই সেই শাস্ত্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষে সেগুলি অবশ্য-দ্রষ্টব্য। যদি কেহ গণিত বা রসায়নশাস্ত্রে প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে

চান, ঐ ঐ বিষয়ে নিজের যে জ্ঞান-পিপাসা, তাহা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে চান, তবে তাঁহাকে রুষীয় ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে, অন্যথা সে সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের, অথবা কেবল ইংলণ্ড কেন, জগতের গৌরব-ভাজন মহাকবি সেক্সপীয়ারের অমৃতময়ী লেখনীর রসাস্বাদ করিবার জন্য কোন্ সুরসিক ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে না চান? রাজনৈতিক কারণ ব্যতিরেকেও রাষিয়ান এবং ইংরাজী ভাষার এত যে আদর, জ্ঞানার্থীদের এত যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রকৃত কারণ হইল, সেই সেই ভাষায় ঐ সমুদয় মহার্ঘ বিষয়ের সন্নিবেশ। যদি অঙ্ক এবং রসায়ন-বিষয়ে রাষিয়ান ভাষা অতটা সম্পন্ন না হইত, বা সেক্সপীয়ার, মিলটন, বাইরন প্রভৃতির অপূর্ব্ব কল্পনা-লোকে, বা নিউটনের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারে ইংরাজী ভাষা সমলঙ্কৃত না হইত, তবে রুষিয়া এবং ইংরাজের অনধিকৃত দেশসমূহেও এই এই ভাষার এত গৌরব কি কদাচ বৃদ্ধি পাইত? ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানময় সংস্কৃত ভাষার ইউরোপেও যে এত আদর, তাহার কারণ কি? পরাধীন ভারতের প্রাচীনতম ভাষার প্রভাব স্বাধীন পাশ্চাত্ত্য জগতে যে ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কালে এমন এক দিন আসিবে, যখন পশ্চিমে প্রত্যেক বিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কোন-না-কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিবেন। কবে কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর

পূর্ব্বে, তমসার তীরে বসিয়া, ক্রৌঞ্চমিথুনের কবি তাঁহার তপঃসিদ্ধ বীণায় ঝঙ্কার দিয়া গিয়াছেন, আর আজও ঐ দেখুন, সকল দেশের সুপণ্ডিত ব্যক্তিই সেই ঝঙ্কার শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া আছেন। বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসের মহাভারত, ভারতের অপৌরুষেয় বেদ-সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় উপনিবদ্ধ বলিয়া সকল দেশের জ্ঞান-পিপাসুই এই ভাষায় আস্থাসম্পন্ন। মহাকবি কালিদাস শিপ্রাতটে বসিয়া যে মোহন বংশীধ্বনিতে ভারতবর্ষকে উদ্‌ভ্রান্ত, একেবারে তন্ময় করিয়া গিয়াছেন, আজও সে বাঁশরী-ঝঙ্কারের যেন বিরাম হয় নাই; ঐ দেখুন, ইউরোপের মেধাবী সন্তানগণ, ঐ মনোজ্ঞ সঙ্গীতের রসাস্বাদের আশায় সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতেছেন। এ দেশীয় শকুন্তলা নাটকের বিদেশীয়-কৃত অনুবাদের অনুবাদ পড়িয়াও সুকবি গেটে আত্মহারা হইয়াছিলেন।[৮৮] জগতের অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল প্লেটো, ইউক্লিড, পিথাগোরাস, এরিস্‌টটল[৮৭] প্রভৃতির মনীষা-সাগরোত্থিত রত্নমালা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক গ্রীক ভাষা এই মরধামে অমরতালাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক আধিপত্যে উল্লিখিত ভাষাসমূহ অকিঞ্চিৎকর হইলেও জ্ঞানের আধিপত্যে, সম্পদের আধিপত্যে ঐ ঐ ভাষা জগতের শিক্ষিত সমাজের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক গগনের চন্দ্র-

সূর্য্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণবের বেলাভূমিতে ঐ যে-সমুদয় প্রাচীন মনীষিগণের সুচিন্তা-রত্নবিমণ্ডিত সৌধাবলী শির উত্তোলনপূর্ব্বক স্মরণাতীত কাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে—জগতের ঐহিকবাদি-গণের পরস্পর বাদ-বিসংবাদ-দর্শনে যেন নীরবে হাসিতেছে—ঐ সকল মনীষা-মন্দিরের কোন দিন বিলোপ ঘটিবে না।

নানাবিধ বিপ্লবে ভারতবর্ষ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইলেও, সেই প্রাচীনকাল হইতে বেদাদি-রত্নহারে সুশোভিত হইয়া সংস্কৃত ভারতী একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি সংস্কৃত ভাষায় বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা প্রভৃতি উপনিবদ্ধ না হইত, যদি কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতি অমর কবিকুলের সযত্নগ্রথিত মণিময় হারে সংস্কৃত ভাষা অলঙ্কৃত না হইত, তবে কি আজ এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনেও সংস্কৃত ভাষা এমনই অক্ষতদেহে ভারতীয় সভ্যতার কিরীটরূপে শোভা পাইত? ভাষার অমরত্বের এবং সর্ব্বত্র প্রসারের কারণ হইল—সম্পদ্। যে ভাষায় যত সম্পদ্, যে ভাষা যত অধিক সুচিন্তা-প্রসূত বিষয়ে বিমণ্ডিত, সেই ভাষার প্রসার জগতে তত অধিক। সে ভাষা যে দেশেরই হউক না-কেন, সকল বিদেশীয়েরাই আন্তরিক যত্নসহকারে সেই ভাষার সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। এইরূপ সংস্কারে হৃদয় দৃঢ় করিয়া, বঙ্গভূমির প্রকৃত সুসন্তানের

ন্যায়, আমরা যদি বঙ্গভাষার আলোচনা করিতে পারি, কালে বঙ্গভাষা জগতের শিক্ষণীয় ভাষা হইবে। বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ন্যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্ত্তমান মনস্বিগণও যদি তাঁহাদের জ্ঞানগরিমার সম্পদ্ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ করেন এবং উত্তর-কালেও যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্ব স্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যান,—এবং এই প্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন এক দিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকেই আগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রবীণতা লাভ করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্ব স্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশপূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরব-বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন। অবশ্য তাহাতে বঙ্গভাষা জগতের সর্ব্বত্র একাধিপত্য করিবে না সত্য, কিন্তু রাষিয়ান, গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষাও পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম আলোচনীয়রূপে গৃহীত হইবে।

অবশ্য এইরূপ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা দু'এক দিনে বা দু'দশ বৎসরে সম্ভব নহে, বা আরম্ভমাত্রেই ফললাভের আশা নাই। কিন্তু যদি যথার্থ দেশ-হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গভাষাকে অক্ষয় করিবার বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, মানুষের অনন্য-সাধারণ কামনায় নিজের জাতীয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ অথবা বর্দ্ধিত করিবার জন্য,—বাঙ্গালী নিজের নিজের জ্ঞানধামতার পরিচয়, স্ব স্ব উপার্জ্জিত জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্যসম্ভার, নিজ নিজ মাতৃ-ভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত যশের সম্মোহনী তৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতির কল্যাণকামনায় একমাত্র বঙ্গভাষাকেই সেব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই দুরূহ বলিয়া প্রতিভাত কার্য্য ক্রমেই সুকর হইয়া আসিবে। আজ যাহা অসম্ভব মনে হইতেছে, কাল তাহা একান্ত সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইবে। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার গৌরব-কেতন কালের অক্ষয় গগনে বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর বিজয়-প্রশস্তি ঘোষণা করিবে।

এই সকল ব্যাপার করিতে হইলে, এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তীর্থজলে অভিষেকের এবং সংযমের প্রয়োজন। বিনা অভিষেকে বা বিনা সংযমে যজ্ঞবেদীতে উপবিষ্ট হইতে নাই। দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব, আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের

বরণীয় করিব,—আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশজন অন্য মার সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে,—এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে অভিষেকপূর্ব্বক ব্রতী হইলে নিশ্চয়ই মনোমত বর লাভ করিতে পারিব। কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই, তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতে লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া দেশের ধন বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া ধনের উপচয় করিব—বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারের সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও, কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। ঊষার অরুণচ্ছটায় যেমন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়, তেমনই আমার মাতৃভাষার আলোকচ্ছটায় পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত হইবে—ভাস্বর হইবে।

এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ সংস্কারে চিত্ত বলীয়ান্ করিয়া তপস্বীর ন্যায় একাগ্র হৃদয়ে বঙ্গবাণীর সেবা করিতে হইবে। নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। বাঙ্গালার

মাটী বড়ই উর্ব্বর। বঙ্গদেশ বড়ই সুজন্মা। অধিকাংশ স্থলই দেবমাতৃক, কচিৎ নদীমাতৃক—আপনা হইতেই বিধাতার কৃপায় বঙ্গে মেধাবীর আবির্ভাব হয়—চিরকাল হইয়াও আসিতেছে। কোথাও-বা সামান্য সেচনের প্রয়োজন হয়,—কিন্তু সুফললাভ সর্ব্বত্রই নিশ্চিত। ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস, কুমারহট্টের রামপ্রসাদ, কৃষ্ণনগরের ভারতচন্দ্র, খানাকুলের রামমোহন, পিলের দাশরথি প্রভৃতি এই বঙ্গেরই ছায়াশ্যামল পল্লী-বিটপীর সুস্বাদু ফল। প্রভাকরের ঈশ্বর, আলালের টেকচাঁদ, নীলদর্পণের দীনবন্ধু, মেঘনাদের মধুসূদন এই বঙ্গেরই অলঙ্কার। বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন যে বঙ্গভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সে ভাষা বা সেই দেশ কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। এখনও—এই ঘোর বিপর্য্যয়ের মধ্যেও—যে দেশে এবং যে ভাষায় পৃথ্বীরাজের[৬৮] ন্যায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের এবং সেই ভাষার শক্তি যে কত বিপুল তাহা মনস্বিমাত্রেরই সহজে বোধগম্য হইবে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে, যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না—হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না। বাঙ্গালী অদৃষ্টবাদী। কিন্তু

তাই বলিয়া তাহারা পৌরুষহীন নহে। মেকলের উক্তির প্রতিবাদ যখন বিধাতাই বাঙ্গালীর দ্বারা করাইতেছেন, তখন অপরের সে সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক হইলেও এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, চণ্ডীদাস-গোবিন্দদাসের বঙ্গে, রামবসু-নিধুবাবুর বঙ্গে, সর্ব্বাপেক্ষা,—প্রেমের প্রবাহ শ্রীচৈতন্যের বঙ্গে কখনও ভাবের বা রসের অভাব হইবে না—প্রাণের অভাব হইবে না। উপাদানের অভাব নাই, কেবল উদ্যোগের অভাব, অনুষ্ঠানের অভাব। এই ত সামান্য উদ্যোগেই ভীরু বাঙ্গালী বীর বাঙ্গালীতে উন্নীত হইতে চলিয়াছে। যাহাদের ঢক্কায় বাঙ্গালীর ভীরুত্ব নিনাদিত হইত, এখন তাহাদেরই কলমধুর বীণায় বাঙ্গালীর বীরত্ব অনুরণিত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, আছে সব, মাল-মস্‌লা কিছুরই অভাব নাই, এখন কেবল জন কয়েক সুশিক্ষিত, কল্পনাকুশল স্থপতি বদ্ধপরিকর হইলেই সঙ্কল্পিত বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে। আজ আমার যে কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। জগতের ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ বঙ্গভাষা অধিকার করিয়া বসিবে। অনতিবিস্তৃত বঙ্গসাহিত্য ক্রমে বিশাল বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইবে।

এই অসাধ্যসাধন করিতে হইলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষ সংযমের প্রয়োজন,—কঠোর তপস্যার প্রয়োজন।

সভ্যগণ, আপনারা আমাকে এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমার প্রতি যেমন আত্মীয়তাপ্রকাশ করিয়াছেন, আমিও যদি আমার ধারণার অনুরূপ, আমার বিবেকের অনুকূল সত্য কঠোর বলিয়া, সম্প্রদায়-বিশেষের স্তুতিনিন্দার দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের অপব্যবহার করা হইবে; তাই আপাততঃ ঈষৎ অপ্রিয় হইলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য যে, পূর্ব্বোক্ত অসাধ্যসাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে যদি কোন দলাদলি, কোনরূপ বিরোধ-ভাব থাকে, তবে তাহা পরিহার করিতে হইবে। মতভেদ নিন্দার কথা নহে, কিন্তু মতভেদ হইলেই যে প্রণয়ভেদ হইবে, আত্মীয়তাভেদ হইবে, ইহা ত আমি বুঝি না। বঙ্গভাষা এখনও বঙ্গের বাহিরে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে নাই। এখনও ভারতের বহির্দ্দেশে বঙ্গভাষার বংশীধ্বনি সম্যকভাবে পৌঁছায় নাই। যে ভাবে, যেরূপে আমি বঙ্গভাষাকে গঠিত করিবার কথা বলিলাম, সেই হিসাবে বঙ্গভাষার এই সবে কৈশোর, এরূপ অপরিপক্ক বয়সে তাহাতে অন্তঃকলহের কীট প্রবেশ করিতে দিলে অচিরাৎ সমস্ত উদ্যম-উদ্যোগ পণ্ড, ভস্মসাৎ হইবে। হিমাদ্রির চির-তুষারস্নিগ্ধ অভ্রভেদী গৌরীশৃঙ্গে যাহারা পৌঁছিতে চাহে, উপত্যকার কঙ্করময় কণ্টকক্ষেত্রেই তাহাদের ক্লান্তি

জন্মিলে চলিবে কেন?) মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে একটা মহাত্যাগ চাই। বিনা ত্যাগে লাভ হইতে পারে না।

আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা আমাদের সকলেরই জননী, মাতৃপূজায় দীক্ষিত হইয়া, মায়ের মন্দিরে তুচ্ছ অলীক এবং ক্ষণিক যশের প্রলোভনে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ করিতে নাই। বিশ্ববিজয়ী সৌধ-নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বহু-কোটী বঙ্গবাসী বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে তবে ঐ সঙ্কল্পিত সৌধের মাত্র ভিত্তি-প্রোথন হইবে। এইরূপ দুষ্কর কার্য্যে, কঠোর কার্য্যে, বঙ্গে যিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য করুন। মায়ের মন্দির-গঠনে সকল সন্তানেরই তুল্য অধিকার। তুল্য অধিকার বলিয়া প্রত্যেককেই যে তুল্য পরিমাণে দ্রব্যসম্ভার যোগাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যিনি যাহা পারেন লইয়া আসুন—মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন। আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ-নির্ম্মাণ করিব। কে কি পরিমাণে মাতৃমন্দিরের দ্রব্যসংগ্রহ করিলেন, ইহার হিসাব-নিকাশ করিব না; এখন হিসাব-নিকাশের সময়ও নহে; করিতে হয়, আমাদের অধস্তন বংশধরেরা তাহা করিবে। আমরা কেবল গড়িয়াই যাইব,—কাজ করিয়া যাইব। এই সময়ে কাহাকেও মনঃপীড়া দেওয়া বা সাময়িক মোহের

কুহকে অন্ধ হইয়া আত্মাভিমানের চরিতার্থতা-বিধান করিতে যাওয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। কোন প্রকার অসংযমের আধিক্য হইলে এই সঙ্কল্পিত স্বর্ণ-সৌধের আশা সমূলে ধ্বংস হইবে, বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করিবার আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইবে। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, হে বঙ্গসাহিত্যের হিতৈষিবৃন্দ! হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ জাতীয় সৌধের স্থপতিবৃন্দ!—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বিরোধ বিস্মৃত হইয়া একই লক্ষ্যে চিত্ত স্থির করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন; সমস্ত ভুলিয়া আপনা ভুলিয়া একমনে একপ্রাণে কার্য্য করুন,—তবেই ত আপনাদের স্পৃহণীয় মৎস্য-চক্র-ভেদ করিতে পারিবেন। একই তীর্থের যাত্রী আপনারা, একযোগে অগ্রসর হউন,—ভিন্নপথে বা অপথে যাইয়া সংহতিক্ষয়পূর্ব্বক অবসন্ন হইবেন না।

বাঙ্গালার আজ বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সকলেরই মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে যে, কি প্রকারে বঙ্গভাষাকে সজ্জিত করিবেন। ধনিনির্ধন-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই একটা প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে। ইহা পরম মঙ্গলের কথা। যখন বান আসে তখন অনেক আবর্জ্জনাও তাহাতে ভাসাইয়া আনে সত্য, কিন্তু

সেই আবর্জ্জনারাশি তটিনীর উভয় তটেই জমিয়া জমিয়া ক্রমে মাটীতে পরিণত হয়। তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য বঙ্গভাষার এই নবীন বন্যায় অনেক আবর্জ্জনাও আসিতেছে, অনেক অপাঠ্য-কুপাঠ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি বিরচিত হইতেছে সত্য, কিন্তু সেগুলি কদাচ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। যাহা উত্তম সৎ, যাহা নির্ম্মল নিষ্পাপ, তাহাই থাকিয়া যায়, অন্য সমস্ত কালের অতলগর্ভে অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ সকল অপাঠ্য-কুপাঠ্য বিষয়ের জন্য বঙ্গভাষার হিতৈষিবৃন্দের তত চিন্তার কারণ নাই।

দেশের সর্ব্বত্র, বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বত্র, যথার্থই যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বাল্যে যে সকল রূপকথা শুনিতে শুনিতে মাতা বা মাতৃষ্বসার কোলে ঘুমাইয়া পড়িতাম, আজ নগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে যখন সেই সকল গল্প,—সেই ‘সাতভাই চম্পা,’ সেই ‘পক্ষিরাজ ঘোড়া,’ সেই ‘শিবঠাকুরের বিয়ে,’ প্রভৃতি শিশুরঞ্জন কথাসমূহ যথার্থই নয়ন-রঞ্জন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে দেখি, তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি! বটতলায় যে কৃত্তিবাস-কাশীদাসের কঙ্কাল রক্ষিত হইত, আজ তাহাতে নবজীবন-সংযোগ দেখিয়া প্রীতিবিহ্বল হইয়া পড়ি। মানুষ যতদিন নিজের সত্তার উপলব্ধি না করে ততদিন প্রকৃত মানুষই হইতে পারে না। আমি কে, কোথা

হইতে আসিয়াছি, আমার কি ছিল, কি নাই, কি অর্জ্জন এবং কতটুকুই বা বর্জ্জন করিতে হইবে—এ চিন্তা যে করে না, সে নরাকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নর বলিতে পারি না। বাঙ্গালী এত দিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম যে কি মধুর, মা-নামে যে কত তৃপ্তি, তাহা এত দিনে বঙ্গসন্তান বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর প্রাণে একটা নবীন বলের সঞ্চার দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি এই যে একটা দেশব্যাপিনী অনুরক্তির লক্ষণ, ইহাকে রক্ষিত এবং ক্রমে বিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। জাতীয় জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হইল, জাতীয় সাহিত্য-নির্ম্মাণে স্পৃহা। সেই স্পৃহা যখন হৃদয়ে একবার জাগিয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ জাতির হৃদয়ে দেখা দিয়াছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই। পালে যখন বাতাস বাধিয়াছে, তরণী এইবার পক্ষিণীর মত চলিবে, আমাদিগকে শুধু সাবধান হইয়া হাল ধরিয়া বসিতে হইবে,—যাহাতে গন্তব্যের বিপরীত দিকে না যাইয়া পড়ি, সে পক্ষে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে। আর যখন যতটুকু আবশ্যক, ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, আমার তরণীকে অনুকূল বায়ুর বশীভূত করিয়া পরিচালিত করিতে হইবে।

যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহাকে সেচনাদির দ্বারা বিবর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত করিতে হইবে

আপামর সাধারণের মধ্যে যাহাতে বঙ্গভাষার প্রতি অনুরক্তি জন্মে,—আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষার সেবক হওয়া চাই, এই ধারণা যত অধিক বদ্ধমূল হইয়া দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের মত থাকিয়া যায়, তৎপক্ষে চেষ্টাপর হইতে হইবে। এই সময়ে ভুলিলে চলিবে না যে, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন বা হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বঙ্গভাষার আলোচনা করেন মাত্র তাঁহাদিগকে লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। কোন আলেখ্যের প্রচ্ছন্ন ভূমি বিশেষ দক্ষতার সহিত কল্পিত না হইলে যেমন মূলচিত্র যতই সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হউক না কেন, কিছুতেই তেমন মনোরম হয় না, তদ্রূপ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, মুষ্টিমেয় বঙ্গসন্তান, স্ব স্ব জ্ঞানগরিমায় যতই বিমণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশে, অথবা চতুর্দ্দিকে ঐ যে কোটী কোটী বাঙ্গালী পড়িয়া আছে, উহাদিগকে নিজের সান্নিধ্যে যতদিন শিক্ষিতগণ টানিয়া আনিতে না পারিবেন, ততদিন বঙ্গের প্রকৃত অভ্যুদয় হইল, স্বীকার করিতে পারিব না। শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প-পল্লব প্রভৃতি লইয়াই ত বৃক্ষ; এই সব ত্যাগ করিয়া, মাত্র মূল স্থাণুটিকে কেহ বৃক্ষ বলে না, বা বৃক্ষের আশা ঐ স্থাণুতে চরিতার্থ হয় না। সুতরাং যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালী জাতি একান্ত মুষ্টিমেয় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বঙ্গের সেই অশিক্ষিত

জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, যতদিন তাহা না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগত শিক্ষাই শিক্ষা নহে, একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইতে হইলে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অনেক অগ্নি-পরীক্ষার প্রয়োজন। কেবল অর্থার্জ্জনের জন্যও শিক্ষা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য—আত্মবিকাশ লাভ করা, হৃদয়ের মার্জ্জনা করা; দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব-গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থ করা। এই ভাবে যদি মানুষ একবার তৈরি হইয়া উঠে—ক্রমে একটা জাতি তৈরি হইয়া উঠে, তবে সেই জাতিকে আর পয়সার জন্য লালায়িত বা গ্রাসাচ্ছাদন-নির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। ঐ প্রকারে গঠিত জাতির কোন স্পৃহাই অপরিপূর্ণ থাকে না, অর্থ ত কোন্ ছার! সুতরাং সর্ব্বাগ্রে চাই, সমাজের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা। যা কিছু কষ্ট বা পরিশ্রম, ঐ প্রথমাবস্থাতেই, পরে একবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে,—ঐ জাতি আপনিই আপনার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। তখন আর তাহাকে প্ররোচিত করিবার প্রয়োজন হয় না। কষ্ট ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি ঠিক বুঝিতে বা ধরিতে না পারি যে, আমি কি চাই, কোন্ বস্তুটি পাইলে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত

হইবে। যদি একবার আমার সেই অভিপ্রেত বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেই দিকে আমার হৃদয়ের যে গতি হইবে, এমন কেহ নাই যে, সে গতি রোধ করিতে পারে। বাঙ্গালী জাতির ইতর-ভদ্র সকলের মনে একবার কোনক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের এবং আমার অভ্যুদয় গ্রথিত,—বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতর-ভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বিশ্বসাহিত্যে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন ঋতুরাজ ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে, এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে, এক মনে সকলে মধুর বাসন্তী মূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে এক ভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননী বঙ্গভাষার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির বিমল প্রভায় বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভুজা বঙ্গভারতী দশভুজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণা। দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। "বাংলার মাটী, বাংলার জলে" পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

একবার ভাবিয়া দেখ, জন্মজন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছিলে, কত তপস্যা করিয়াছিলে, তাই এমন মধুর বাঙ্গালায় আসিতে পারিয়াছ। স্নিগ্ধশ্যামল কাননকুন্তলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় যাহাদের দেহ পরিপুষ্ট, বঙ্গের নিত্য-নবীন নীল নভশ্চন্দ্রাতপতলে শিশিরস্নাত দূর্ব্বাসনে যাহাদের উপবেশন, আর কলকণ্ঠ শুক-কোকিলের মধুর কাকলীতে যাহাদের কর্ণবিবর পরিপূর্ণ, তাহাদের হৃদয়ে কল্পনার অভাব হইবে কেন? সম্মুখে যাহার পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী, তাহার কণ্ঠ পিপাসায় শুকাইবে কেন? বঙ্গবাসী, তোমাদের কিসের অভাব? তোমরা কাহার চেয়ে কম? কিসে দুর্ব্বল? বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যাহাদের আদর্শ গ্রন্থ,—সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা যাহাদের আদর্শ সতী,—রাম, যুধিষ্ঠির, শিবি, দধীচি, ভীষ্ম, অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ নায়ক,—ভরত, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ ভ্রাতা,—তাহাদের আবার অভাব কিসের? অতীতের বিস্ময়পূর্ণ চিত্রশালা হইতে একবার এই দিকে তাকাও। ঐ দেখ, তোমাদের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া অক্লান্তশ্রমে তোমাদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ কত মনোহর পত্র-পুষ্প-পল্লবে বঙ্গসাহিত্যের মণ্ডপ সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণপাতী যত্নে রত্নমণ্ডপের রত্নবেদিতে আমার রত্নহারবিভূষিতা বঙ্গবাণীর উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, মায়ের মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা

করিয়া গিয়াছেন, তোমাদের এখন পূজায় বসিতে হইবে।

বঙ্গসাহিত্য-সেবিগণ, সদ্ভাবচন্দনে মনঃপ্রাণ চর্চ্চিত করিয়া তোমাদের সাহিত্য-মণ্ডপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও। একবার সাতকোটী বাঙ্গালী সমস্বরে বঙ্গভারতীকে 'মা' বলিয়া ডাক,—দেখিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে ডাকে চমকিয়া উঠিবে। আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে, পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে সে ডাকের সাড়া পৌঁছিবে। বঙ্গভারতী বিশ্বভারতীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন। সাময়িক স্তুতিনিন্দা, বাদবিসংবাদ, স্বার্থচিন্তা প্রভৃতি একপদে বিস্মৃত হইয়া একবার সাধকের মত, যোগীর মত, ব্রত-দীক্ষিতের মত সংযতভাবে জননী বঙ্গভাষার পাদ-পূজায় প্রবৃত্ত হও; একবার মাতৃপ্রেমে, জাতীয় প্রেমে, জাতীয় সাহিত্যের প্রেমে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া সাতকোটী কণ্ঠে, উদাত্ত স্বরে মাতৃভাষাকে 'মা' বলিয়া ডাক দাও; বিশ্ব কাঁপাইয়া একবার বল,—

"তোমারি তরে, মা! সঁপিনু এ দেহ,
তোমারি তরে, মা! সঁপিনু প্রাণ;
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।" ৩১

দেখিবে, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিতে মুখর করিয়া তোমাদের এই আবেগস্খলিত গীতি দিব্যধামে মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়িয়াছে। দেখিবে, স্থলে জলে, পর্ব্বতে কন্দরে. প্রান্তরে কান্তারে বঙ্গভারতীর বীণার অনুরণন হইতেছে,— বঙ্গভাষার মধুর বাঁশী সুমধুর লগ্নে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে,—চিরনবীনা ধরণী রোমাঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালীর দেবতাকে বক্ষে আসন পাতিয়া বসাইতেছেন।

মনে রাখিও, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই,—কল্পনার অগম্য স্থান নাই। মানুষের যে কত অসীম শক্তি, তাহা মানুষ নিজে অনেক সময়ে বুঝিতেই পারে না। তাহা যদি পারিত, তবে এই পৃথিবীর দশা এত দিনে অন্য প্রকার হইত। আমার বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিব, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞার পরিপূরণের জন্য যাহা সঙ্গত মনে হইবে, তাহাই অসঙ্কোচে করিব। এই মন্ত্রে পরিপূত হইয়া ব্রত আরম্ভ কর—সিদ্ধি হইবে। কালে অমর হইতে পারিবে—বাঙ্গালী জাতি ও তাহার বঙ্গভাষা জগতে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যদি কখনও নৈরাশ্যের ভীষণ মূর্ত্তিতে চমকিয়া উঠ, কালের করাল কশা দর্শনে ভীত হও, তখন তোমারই বরেণ্য কবি হেমচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া জলদ-প্রতিম স্বনে তোমার দেশবাসীকে শুনাইও—

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,

হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।”[১০]

আর সেই সঙ্গে বলিও—হে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য-মন্দিরের ভবিষ্য স্থপতিবৃন্দ,

“যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।”[১১]

সংক্ষিপ্ত বিবৃতি

১ সারদামঙ্গল, প্রথম সর্গ, ৩২।

২ "ইন্দ্রালয়ে সরস্বতীপূজা" হইতে গৃহীত।

৩ "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং;" ছান্দোগ্যোপনিষৎ, সপ্তম অধ্যায়, ২৩শ খণ্ড।

৪ "কেবল আসার আশা, ভবে আসা; আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছল।
ওমা! মিঠের লোভে তেতোমুখে সারাদিনটা গেল॥"

৫ ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বে বাঁকিপুর-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে। এই পুস্তকের শেষ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৬ উদ্ধবদাস, সুরদাস, মীরা, তুলসীদাস—উত্তর-ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ কবি। মীরার ভজন, তুলসীদাসের রামায়ণ, সুরদাসের পদ, হিন্দী সাহিত্যের পরম সম্পদ্। রামপ্রসাদ কালীভক্ত কবি; চণ্ডীদাস বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ কবি। উদ্ধবদাস বাঙ্গলার বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।

৭ কৃত্তিবাস—ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে আশুতোষ ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের কথা স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস—বৈষ্ণব সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি। মাইকেল মধুসূদন—দুই বৎসর পূর্ব্বে মাইকেলের সমাধিপ্রাঙ্গণে আশুতোষ যাহা বলিয়া ছিলেন তাহা এই পুস্তকের তৃতীয় প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল-জীবনী দ্রষ্টব্য।

হেমচন্দ্র—১৮৩৮-১৯০৩ ; "বৃত্রসংহারের কবি।"

বঙ্কিম—১৮৩৮-১৮৯৪ ; বাঙ্গলা সাহিত্যের "সম্রাট্"।

দীনবন্ধু—১৮২৯-১৮৭৩ ; কবি ও নাট্যকার ; হাস্যরসের জন্য বিখ্যাত, "নীলদর্পণে"র নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে স্মরণীয়।

৮ ত্রিশ কোটী—১৯৩১-এর আদমসুমারীতে ভারতের লোক-সংখ্যা ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮।

৯ তেঁতুলের পাতার ঝোল—নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বুনো রামনাথ কৃষ্ণনগরের মহারাজকে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কোনও অভাব নাই—ক্ষেতে ধান আছে আর গৃহিণী তেঁতুলের ঝোল রাঁধেন, তাহাতেই পরিতৃপ্তি। স্বল্পে-সন্তুষ্ট বিদ্যানুরাগী ব্রাহ্মণের আদর্শ।

১০ সাত-আটটি বিশ্ববিদ্যালয়—এখন আঠারটি।

১১ সরস্বতীর ধ্যানের শেষ চরণ।

১২ দাশরথি রায়।

১৩ সংস্কৃতভাষার বাক্যভঙ্গির আদর্শে।

১৪ পারাঞ্জপে (জন্ম ইং ১৮৭৬)—মহারাষ্ট্রদেশীয় বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। গোখ্‌লে (১৮৬৬-১৯১৫)—ভারত-সেবক-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; মহারাষ্ট্রের অধিবাসী; ভারতীয় সরকারের আয়ব্যয়ের নিপুণ ও কঠোর সমালোচক; নির্ভীক, আড়ম্বরশূন্য, সংসারে নিস্পৃহ, হিসাব-পরীক্ষায় সূক্ষ্মবুদ্ধি, প্রকৃত দেশসেবক। রানাডে (১৮৪২-১৯০১)—মারাঠা ব্রাহ্মণ; বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম জজ; নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত, সংস্কার-আন্দোলনের বিশিষ্ট সমর্থক; পুণার সার্ব্বজনিক সভা ও প্রার্থনা-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩)—নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ব্রহ্মোপাসনার

প্রবর্ত্তক, ও ব্রাহ্ম সভার প্রতিষ্ঠাতা; বর্ত্তমান ভারতের চিন্তানায়ক, ও যাঁহাদের দানে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের একজন। রবীন্দ্রনাথ (জন্ম ইং ১৮৬১) বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, বিশ্ববরেণ্য, বাঙ্গালা সাহিত্যকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র (১৮২০-১৮৯১)—বিদ্যাসাগর, দয়ার সাগর, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষভাবে পুষ্ট করিয়াছেন, সমাজ-সংস্কারক ও স্বাধীনচেতা বলিয়াও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। প্রফুল্লচন্দ্র (জন্ম ইং ১৮৬১)—বিখ্যাত রাসায়নিক, বন্যা-দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সঙ্কট হইতে দেশবাসীর পরিত্রাণের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত, চিরকুমার, বঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চ্চার নবযুগ আনিয়াছেন, ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তারে উৎসাহী। জগদীশচন্দ্র (জন্ম ইং ১৮৫৮)—তড়িৎ-বিজ্ঞানে দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত; উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে তাহা সূক্ষ্ম স্বয়মুদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। রাসবিহারী (১৮৪৫-১৯২১)— প্রগাঢ় আইন-জ্ঞানের জন্য প্রচুর অর্থ ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঁহার দান পনের লক্ষ টাকারও অধিক; জ্ঞানবীর ও দানবীর। বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২)—বাঙ্গালার তথা ভারতের গৌরবস্থল; শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় ইঁহার অধ্যাত্ম-জ্ঞান প্রদীপ্ত হয়, ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; পরে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৯৩ খ্রীঃ চিকাগোর ধর্ম্মসভায় বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন; ইঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য জগতে হিন্দু-ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং বর্ত্তমান ভারতে কর্ম্মযোগের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ (১৮৪৮-১৯২৫)—দেশবিশ্রুত রাজনৈতিক নেতা, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, জাতীয় মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং শেষজীবনে মন্‌টেগু-সংস্কার-প্রবর্ত্তনের

পর বঙ্গের স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সুব্রহ্মণ্য (১৮৫৬-১৯১৬)—মান্দ্রাজের অধিবাসী; সমাজ-সংস্কারক ও দেশহিতৈষী; "হিন্দু" ও "স্বদেশমিত্রম্" নামে মান্দ্রাজের দুইখানি পত্রিকার সহিত ইঁহার যথেষ্ট যোগ ছিল; জাতীয় মহাসভার ইনিও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

১৫ প্রথম শ্লোকটি হিতোপদেশে সুহৃদ্ভেদের ১৬শ শ্লোক; দ্বিতীয়টী শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে উদ্ধৃত আছে।

১৬ দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ"।

১৭ গীতগোবিন্দের চতুর্থ শ্লোকে জয়দেব এই সকল কবির পরিচয় দিয়াছেন এবং কৌশলে নিজের বৈশিষ্ট্যের কথাও বলিয়াছেন। "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ" ইত্যাদি।

১৮ যেমন ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে করিয়াছে।

১৯ ছান্দোগ্যোপনিষদে সপ্তমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ডে প্রথম শ্লোকে অনুরূপ বচন—শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে—বিজ্ঞান যাহাদের আছে এমন শত লোককে একজন বলবান্ আকম্পিত করেন।

২০ সকলের মনোরঞ্জন করা যায় এরূপ বাক্য অত্যন্ত দুর্লভ। কিরাতার্জ্জুনীয়ম্, চতুর্দ্দশ সর্গ, পঞ্চম শ্লোক।

২১ জ্ঞাতসারে অশোভন কিছু করি নাই; লোকে কি বলিবে তাহা লোকেই জানে। - নৈষধচরিতম্, নবম সর্গ, শ্লোক ১২৩ সংখ্যা। মূলে আছে—"পরস্তু যদ্বেদ স তদ্বদিষ্যতি।" (জীবানন্দ-ধৃত পাঠ)

২২ মোহে যাহা করিতে চাহিতেছ না, ("সংস্কারবশে) অবশ হইয়াও তাহা করিবে।—গীতা, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৬০ সংখ্যা।

২৩ পার্থ, এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র যে অনুসরণ করে না, তাহার জীবন পাপময়, ইন্দ্রিয়-সেবায় তাহার রতি, অতএব তাহার বাঁচিয়া থাকা নিষ্ফল।—গীতা, তৃতীয় অধ্যায়, ১৬শ শ্লোক।

২৪ উঠ, জাগ, অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হও।—কঠোপনিষৎ, ৩।১৪।

২৫ "ইন্দ্রালয়ে সরস্বতীপূজা"।

২৬ চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—বঙ্গভাষা।

২৭ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে কৃত্তিবাস ভিন্ন চতুর্দ্দশ লেখকের পরিচয় তো আছেই, তাহা ভিন্ন যাঁহারা আংশিক অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও উল্লেখ আছে।

২৮ কবির আত্মপরিচয়ের "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস" এই ছত্রটি হইতে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় জোতিষ-গণনার সাহায্যে কৃত্তিবাসের জন্মতারিখ ১৩৯৯ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৯ এই সাক্ষাতের সম্পূর্ণ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে প্রদত্ত কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ পাঠ করিলে জানা যাইবে।

৩০ বঙ্গে কুলীন মুখোপাধ্যায় বংশ এই শান্তিপুর ফুলিয়া গ্রাম হইতে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে 'ফুলিয়ার মুখটি' বলে। আশুতোষ স্বয়ং এই বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

৩১ কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ হইতে। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, গৌড়ীয় যুগ)

৩২ হেমচন্দ্রের "জীবন-মরীচিকা"—"ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়" ইত্যাদি।

৩৩ এই মহোৎসবের প্রধান উদ্‌যোক্তা, নদীয়ার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আই. সি. এস্.।

৩৪ মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতা "কৃত্তিবাস" হইতে।

৩৫ মধুসূদনের মৃত্যুর পরে লিখিত হেমচন্দ্রের "স্বর্গারোহণ"।

৩৬ দ্বিজেন্দ্রলালের "ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা" হইতে।

৩৭ বিহারীলালের সারদামঙ্গল, উপহার।

৩৮ ঐ সারদামঙ্গল, প্রথম সর্গ, ১৭।

৩৯ ঐ ঐ ২০।

৪০ বর্ত্তমান কালে সমালোচকেরা এ বিষয়ে একমত নহেন।

৪১ চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—মিত্রাক্ষর।

৪২ ঐ কবিতা।

৪৩ ঐ মিত্রাহার।

৪৪ নবীনচন্দ্র সেন।

৪৫ 'হিরণ্ময়েন জ্যোতিষা সত্যস্যাপাবৃতং মুখম্' তুলনীয়।

৪৬ তিলোত্তমাসম্ভব ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; কবি-মাতৃভাষা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর অন্যান্য কবিতা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে রচিত।

৪৭ বীরাঙ্গনা-কাব্য, তৃতীয় সর্গ।

৪৮ সে কবিতায় বা সে বনিতায় কি কাজ, যাহার পদবিন্যাস মাত্রে মন মুগ্ধ না হয়?

৪৯ ব্রজাঙ্গনা—সখী।

৫০ মেঘনাদবধ-কাব্য, তৃতীয় সর্গ।

৫১ কাব্যপ্রকাশের প্রথম শ্লোক—কবির বাণীর বর্ণনা।

৫২ চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—উপক্রম।

৫৩ উপরের উদ্ধৃত অংশগুলি প্রায় সকলই উপক্রম কবিতা (চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী) হইতে গৃহীত।

৫৪ কবিতামালা—অসম্পূর্ণ স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী।

৫৫ চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—বঙ্গভাষা।

৫৬ রবীন্দ্রনাথের গান।

৫৭ চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—ব্রজবৃত্তান্ত।

৫৮ মেঘনাদবধ, প্রথম সর্গ।

৫৯ নবীনচন্দ্র সেন।

৬০ রঙ্গপুরে প্রদত্ত।

৬১ ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে বঙ্গবাসীর সংখ্যা ৫, ১০, ৮৭, ৩৩৮।

৬২ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ যেরূপ আচরণ করেন, অন্য লোকেও সেইরূপ করে।—গীতা, তৃতীয় অধ্যায়, ২১শ শ্লোক।

৬৩ গুণ আদরণীয়, গুণী স্ত্রী কি পুরুষ, বয়স কত, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই।—উত্তররামচরিতম্।

৬৪ তোমার চিত্ত হইতে মধু ক্ষরিত হউক, তোমার মুখ হইতে মধু ক্ষরিত হউক। তোমার শীল বা আচার হইতে মধু ক্ষরিত হউক, তোমার জগৎ মধুময় হউক।

৬৫ "মর্ত্ত্যের দেবতা" নামক কবিতা হইতে গৃহীত। "সাহিত্য-পুষ্পাঞ্জলি" পুস্তকে কবিতাটি দেওয়া আছে।

৬৬ শকুন্তলার অনুবাদ—সার উইলিয়ম জোন্স কৃত ইংরেজী অনুবাদের জর্ম্মন অনুবাদ। গেটের মন্তব্য—"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল-লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতি-জনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান-শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।" (বিদ্যাসাগর)

৬৭ প্লেটো—খ্রীঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭; বিখ্যাত দার্শনিক।

পিথাগোরাস—খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে জন্ম; ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দার্শনিক-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইউক্লিড—জ্যামিতিবিদ্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত। এরিস্টটল—প্লেটো ছিলেন সোক্রাটিসের শিষ্য; প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল; আলেকজান্ডারকে বিদ্যা শিক্ষা দেন। পাশ্চাত্য তর্কবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা।

৬৮ পৃথ্বীরাজ—যোগীন্দ্রনাথ বসু-রচিত মহাকাব্য। ইং ১৯১৬ খ্রীঃ প্রকাশিত।

৬৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান।

৭০-৭১ হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত।